ঢেউ

প্রথম সংখ্যা-মে,২০২৪

রেড

প্রথম সংখ্যা– মে, ২০২৪

সম্পাদনা

চূড়ান্ত সাহা

শাহরিয়ার আমিন

সাদিক রহমান

বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ

মুর্শেদুল আজাদী

যোগাযোগ

মোবাইল

০১৬১৭-৮৮৪৭৯৯

ই-মেইল:

PDSU.Bangladesh@gmail.com

মূল্য

৩০ টাকা

পিডিএসইউ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

নয়া ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের অর্থনীতি আধা-সামন্তীয়– বি.ডি.রহমতউল্লাহ

৫-১০

কমরেড চারু মজুমদার ও তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষা– সৌভিক রেজা

১১-১২

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা– কানন চৌধুরী

১৩-১৬

সমতার সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্বিচারী চরিত্র– নাদিরা ইয়াসমিন
১৭-২২

বহু কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা– সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপক্ষ নয়– রেভ্যুলুশনারী কমিউনিস্ট– নরওয়ে– অনুবাদঃ মোয়াজ বিন সাইফুল

২৩-২৫

ভারতে ব্রিটিশদের চালিত দাস ব্যবসা ও নিপীড়ন– মুর্শেদুল আজাদী

২৬-২৯

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বাংলাদেশের জনগণের শত্রু– শামীম আহমেদ

৩০

শ্রেণী সংগ্রামে ছাত্র-যুবাদের অবস্থান ও করণীয়– চূড়ান্ত সাহা

৩১-৩২

সম্পাদকীয়

শ্রমিক কৃষকের লড়াইয়ের সহযোদ্ধা হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু। একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-উপনিবেশিক রাষ্ট্রে যেখানে শ্রমিক-কৃষকেরা প্রত্যহ সংগ্রামে লিপ্ত নিপীড়ক শ্রেণীসমূহের সাথে, সেই শ্রেণী সংগ্রামকে উর্ধ্বে তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের প্রকাশ। সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের যে শ্রেণী ঘৃণা তার জ্বালানী মজুদ আছে রাষ্ট্রকাঠামোর সমগ্র অংশে, তাকে খুঁজেখুঁড়ে বের করতে হয় না, তা স্পষ্ট, এই সমস্ত শ্রেণী ঘৃণার ঐক্যের একটি মাধ্যম হতে চায় আমাদের এই পত্রিকা। শ্রমিক, কৃষক, কেরানি, ক্ষুদে ব্যবসায়ী কিংবা শহর থেকে গ্রামে দারিদ্র্য সীমানার আশপাশে যাদের বসবাস তাদের প্রত্যেকের শ্রেণী ঘৃণার ঐক্য ভীষণ জরুরী। দুনিয়ায় নিপীড়িত শ্রেণী, জাতি ও জনগণের ঐক্যের প্রচারক হোক আজকের ছাত্র-যুবারা। অনগ্রসর মানুষের সংবেদনশীল মিত্র হোক তারা। বাংলাদেশের শ্রেণী জাতি ও লিঙ্গগত নিপীড়নের যে আধা-সামন্তীয় প্রকাশ যাতে আক্রান্ত মানুষ দাসত্ব-নিগ্রহ ও পরাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয় শর্তহীনভাবে। সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা আজকের বিপ্লবী কর্তব্য। যাতে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হবে শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির পথ, পাহাড়ের স্বায়ত্তশাসন, আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার, নারীর অধিকার।

বিপুল আকাঙ্ক্ষার জালে ক্রমশ বন্দিত্বের শিকার আজকের ছাত্র-যুবরা। সাম্রাজ্যবাদ তার শ্রেষ্ঠ জীবনের স্বপ্নে বিভোর করে তুলছে তাদের। তথাকথিত উন্নত রুচি, সংস্কৃতির সেবাদাস হতে উদ্বুদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত, তার চলচ্চিত্র থেকে বিউটিসোপ পর্যন্ত সমস্ত উপকরণের মাধ্যমে। তার শিক্ষা শেখাচ্ছে তথাকথিত নীতিনৈতিকতা ও গণতন্ত্র। এবং তৈরি করছে বিবিধ আকাঙ্ক্ষা। যেন জীবন এমন এক এডভেঞ্চার, যাকে লুফে নিতে হয় এবং শ্রেণী সেখানে উহ্য, যেন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। আবার নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক-কৃষকের সন্তানরা চাকরির আশায় বসে থাকে এক ধ্বংসস্তুপের উপর। এ দেশে বেকারত্ব এক সাধারণ ঘটনা। আবার কোটি টাকা লুটপাট-দুর্নীতিও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমাদের কাছে। সমগ্র শিক্ষা কাঠামো আজ গণ-বিরোধী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র ও সরকার দলীয় পেটোয়া বাহিনীর রাজত্ব।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত এবং আমলা-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া ও আধা সামন্তবাদী শ্রেণীপক্ষ অবলম্বনকারী । এই ব্যবস্থায় শ্রমিক কৃষক দূরের কথা বর্তমানে মধ্যবিত্তের পক্ষেও তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার অর্জন ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা কষ্টকর। জাতীয় পুঁজির বিকাশ বাধাগ্রস্থ হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত এদেশে। নতুন শিক্ষাক্রমে মৌলিক শিক্ষার দর্শনগত ভূমিকাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। “প্রযুক্তিগত শিক্ষা” “কর্মমুখী শিক্ষা” “দলগত শিক্ষা” ইত্যাদি শব্দচয়নের আড়ালে শিক্ষা কাঠামোকে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির কেরানী ও তাদের ভাবাদর্শিক দালাল তৈরির কারখানা হিসেবে হাজির করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানমনস্কতা– মানবিকতাকে ছেঁটে ফেলে পশ্চাদপদ গোঁড়ামিবাদী সামন্তীয় ধ্যানধারণাকে উসকে দেয়া হচ্ছে। ছাত্র যুবাদের সমগ্র নিপীড়িত জাতি ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নকরণের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণী তাদের শ্রেণী শোষণকে পাকাপোক্ত করছে। তাই জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের লড়াইকে এই মুহূর্তে কৃষি বিপ্লবী সংগ্রামের অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজ নির্মাণের মধ্য দিয়েই ছাত্র-যুবারা প্রকৃত গণমুখী শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। একই সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে জাতীয় ভিত্তিক পুঁজি গঠনে রাখতে পারবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আজকের সংশোধনবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে, আধা সামন্তীয় ও আমলা-মুৎসুদ্দী শোষণের বিরুদ্ধে কিছু না বলে তার সেবাদাস হয়ে টিকে থাকতে চায় নির্বাচনী কায়দায়। তাই তার প্রতিপক্ষ কেবল বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও প্রহসনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার জয়ী দল। গণবিরোধী সরকারকে ক্ষমতাহীন করার একমাত্র পথ নিপীড়িত জাতি ও জনগণের শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করে তোলা। সংস্কার– বিদেশী শক্তির পদলেহন জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে না।

এক্ষেত্রে ত্রাতা নয়, উদ্ধারকারীও নয়, সংশোধনবাদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া ছাত্র-যুবদের মুক্তির প্রথম শর্ত। সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদ শোষকদের অদৃশ্য মিত্র হিসেবে কাজ করে আর অন্যদিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে গণবিরোধী ও শোষকের পক্ষাবলম্বন করে। কালচারাল একটা প্রোগ্রেসের কথা এই সংশোধনবাদীরা বলে। তা কার প্রোগ্রেস? বুর্জোয়া এলিটের পাশাপাশি নয়া এলিট মিডলক্লাস তৈরী করা প্রোগ্রেস? আবার সেই ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী রুচি সংস্কৃতি চলে আসছে? খুবই স্পষ্টভাবে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উপেক্ষিত থাকছে চিরকালই। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীকে পুঁজি করে সংশোধনবাদ যে মধ্যবিত্ত রাজনৈতিকদের ক্লাবে পরিণত হয়েছে এ বক্তব্য ’৭০ থেকেই জোরালোভাবে বলা হচ্ছে। তাই পথ একটাই সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখা। কিন্তু এর দ্বারা আক্রান্ত আমাদের বিপুল মিত্রকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আহ্বান জানাতে হবে বারবার প্রতিনিয়ত।

আজকে সমস্ত বিশ্বজুড়ে এক তীব্র অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। অর্থনৈতিক ভাঙনের প্রতিফলনরূপে আমরা দেখছি যুদ্ধ। তাতে নিহত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। ধ্বংস হচ্ছে প্রকৃতির উপকরণসমূহ। এমন পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়াই যুদ্ধের বিপরীতে। নিশ্চয়ই এইসব যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা। কিন্তু এই বিবৃতিই কি যথেষ্ট? এই মুহূর্তে যুদ্ধগুলোকে পুঁজিবাদের, সাম্রাজ্যবাদের, ঔপনিবেশিক আগ্রাসনবাদের, অবধারিত ফল বা অনিবার্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা খুব জরুরি। সেইসাথে যুদ্ধগুলোর প্রকৃত চরিত্র উন্মোচিত করে সচেতন করতে হবে জনগনের প্রতিটি বিপ্লবী অংশকে। একদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনে সাম্রাজ্যবাদ ও ইজরাইল মানুষের মৃত্যুর কোনো মূল্যই দেয়না। আমরা কি কেবল সমবেদনা আর শোক প্রস্তাব করবো তাতে? আমরা ইউক্রেন, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর সকল শোষিত জনগণের পক্ষে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই দুর্বিনীত লোভ আর কর্তৃত্বকে আঘাত করতে হলে তাকে নগ্ন করে দেখাতে হবে, দেখাতে হবে আমেরিকার গণতন্ত্র কেবল মারণাস্ত্রের উপর টিকে আছে, রাশিয়া তার সশস্ত্র আগ্রাসনে ধ্বংস করছে মানুষ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জার্মানি-ফ্রান্সের একচেটিয়া মুনাফার নাম। পৃথিবীর দেশে দেশে এরা কারখানা করে নিজেরা বা তাদের অনুগামীদের সহযোগে আর লুট করে সম্পদ, অর্থ আর শ্রম। গার্মেন্টসে, কয়লা খনিতে, গ্রাফাইটের মাইনে, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কিংবা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে প্রাণ ও প্রকৃতিকে এরা আক্রান্ত করে এবং এভাবে ছড়িয়ে দেয় পুঁজিবাদী মুনাফার থাবা বিশ্বজুড়ে।

ন্যাটো, বিগ বি, কোয়াড সমস্ত যখন প্লাস হচ্ছে তখন আতঙ্কিত পৃথিবীর মানুষ। যেকোনো যুদ্ধের সম্ভাবনা যেন এক মুনাফার দিক উন্মোচন করে। আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গোলআলু সবকিছুর বাজার চড়া। দেশে দেশে গড়ে ওঠে সিন্ডিকেটের লুটপাট। এরা এইসব আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটেরই মানস-সন্তান অথবা অনিবার্য ফলাফল। পৃথিবী প্রকৃতই এখন একইসূত্রে গাঁথা কিন্তু তার স্বার্থ মানব ঐক্য নয় বরং শোষণের ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খল রচনা। তাই যুদ্ধকে স্পষ্ট করতে হবে আজ, স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে জনগণের কাছে। জনগণতান্ত্রিক লড়াইয়ে জনগণের সমস্ত বিপ্লবী অংশকে যুক্ত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

রেড যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে জনগণের সংগ্রামের দিকগুলোকে হাজির করতে চায়, তেমনি শিক্ষার্থীদের মাঝে স্পষ্ট করতে চায় শ্রেণীগত শোষণ এবং বেকারত্ব-হতাশা-আকাঙ্ক্ষার উৎসমূল এই গণবিরোধী রাষ্ট্র। শোষণ ও অসাম্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ধী ও ধৈর্যের সাথে প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোশ উন্মোচন ও মুক্তির জন্য কৃষি বিপ্লবের পথকে বিকশিত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে এই পত্রিকা।

নয়া ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের অর্থনীতি আধা-সামন্তীয়

বি.ডি.রহমতউল্লাহ

১. পটভূমি

এটা খুবই স্পষ্ট যে আমাদের মতো নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবা-মেহনতী জনগণ নির্মমভাবে শোষিত ও লুণ্ঠিত হচ্ছে। এটা স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদী আধিপত্যবাদের নির্মম শোষণের সাথে এদেশে এদের দালাল মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া ও আধাসামন্তবাদী শাসকশ্রেণী ও কৃষক-শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণকে নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করছে।

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি বলে এখানে নিখাঁদ পুঁজিবাদেরও উত্থান হয়নি। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্তবাদের উচ্ছেদ না ঘটিয়ে, ভূমি সংস্কার না করে সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া এক লুটেরা মুৎসুদ্দী পুঁজিতান্ত্রিক ও আধাসামন্তবাদী শাসন ও শোষণব্যবস্থার আধিপত্য কায়েম হয়েছে। জোতদার ও সামন্ত প্রভুদের বৃহদাংশ লুটেরা মুৎসুদ্দীতে রূপান্তরিত হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। শাসক ও শোষকগোষ্ঠির অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে সম্পদ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়ায় মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়ার চরিত্রধারণ করেছে। লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় এ শোষকরা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি সাংস্কৃতিক মান, সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষা-দীক্ষার ভাবাদর্শে এরাই সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। অর্থনীতির গতিধারায় বাংলাদেশে আজ এই লুটেরা মুৎসুদ্দী লুম্পেন বুর্জোয়া ও আধাসামন্তবাদী শ্রেণী শাসন ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে, ব্যবসাতে, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থায়, বে-সরকারী বিদ্যাপীঠে, চিকিৎসা কেন্দ্রের মালিকানায়, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দখল করে আছে।

২.বাংলাদেশের প্রাপ্ত ও প্রাপ্য সম্পদ

বাংলাদেশ মোট ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার ভূ-এলাকা নিয়ে গঠিত একটি সুজলা, সুফলা,শস্য-শ্যামলা নদী মাতৃক উর্বরা ভূমির দেশ। এ জমিনের ৮৭,৭০০ বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে চাষযোগ্য জমি, যা মোট ভূমির প্রায় ৬৭% অংশ। বনাবৃত এলাকার পরিমাণ ২৩,৬১১ বর্গ কিলোমিটার, অনাবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৪৮,৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার । এর মধ্যে নদী, খাল, বিল ইত্যাদির মোট গড়পড়তা ৩০ ফুট চওড়া ধরলে জল আবৃত এলাকার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০,৩৩০ বর্গ কিলোমিটার।

শোষণের ধরণ ও প্রকৃতি বের করতে এ জমি থেকে আমরা কি আয় পাচ্ছি সে হিসেব করা প্রয়োজন। প্রয়োজন এজন্য যে, জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে রূপান্তরিত সম্পদ বা অর্থ লুট হচ্ছে কি না এবং হলে তার পরিমান কতো এবং এ লুণ্ঠনের পরিমান অন্যান্য লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে বেশি কিনা, বেশি হলে কি পরিমান বেশি তা আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। এ ধরনের লুণ্ঠনের ফলে দেশের কোন শ্রেণী সবচেয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে তা দেখা যেমন প্রয়োজন তেমনি এ জমি/ফসলকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তি এবং লুটেরা মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া অধিপতি ও আধাসামন্তবাদী লুণ্ঠনের মচ্ছব গড়ে উঠলো কিনা তাও আমাদের দেখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের উর্বরা জমি এক-ফসলী, দু-ফসলী ও তিন-ফসলী। জমির ভিন্নতা ও সেচ কার্যের সুবিধা অসুবিধা বিশ্লেষণ করে এসব জমি থেকে বছরে যেসব ফসল পাওয়া যায় তার একটি স্পষ্ট হিসাব করা দরকার। সবকিছু বিবেচনায় এনে অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে চিহ্নিত করে বার্ষিক জাতীয় উৎপাদনে কোন খাতের কতো হিস্যা শতকরা হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নীচে বিধৃত হলো।

৩. বাংলাদেশ কি একটি কৃষি অর্থনীতির দেশ?

বাংলাদেশ একটি কৃষি ও নদী নির্ভর সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ। ভূমি সংস্কার হয়নি বলে এবং কৃষিব্যবস্থায় পুঁজিবাদী পন্থা অনুসৃত না হওয়ার ফলে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নদী, বন্যা বা খরার উপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল। বার্ষিক উৎপাদনে সরকারী বিবিএসের তথ্য বিশ্লেষণ করেই বলা যায় এখনো কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট খাত সমূহ থেকেই বার্ষিক আয়ের শতকরা প্রায় ৬০% আসে। সরকারী হিসেবে কৃষি খাতের এ অবদানের কথা স্বীকার করা না হলেও আমরা কিভাবে এটা বলছি? সব তথ্য ও উপাত্তসমূহ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সরকারী হিসেবে বার্ষিক জাতীয় উৎপাদনে ভূমিকা রাখে এমন অনেক উপাদান এবং অর্থকরী কার্যাবলী যেমন কৃষির জন্য পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য উপাদান সংশ্লিষ্ট আয়, কৃষিকেন্দ্রিক বিভিন্ন সেবাখাতের আয়, কোল্ড স্টোরেজ, প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলজাত ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য, হারবাল ও ভেষজ প্রক্রিয়াকরণ, কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক অর্থনীতি ও আয়, কৃষি সংশ্লিষ্ট আবাসন ও গৃহ নির্মাণের আয়, চিকিৎসা ও কৃষি

সংশ্লিষ্ট নির্মাণ খাত, পরিবহন খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, সেচ, কৃষি পণ্য রফতানী প্রক্রিয়াকরন শিল্প, ধানের তুষ, পোল্ট্রি ও গরুর গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আরো অনেক শিল্প আয়ের সম্পৃক্ততা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে এর বিরাট একটি অংশই অর্জিত হয় কৃষি, খাদ্যপণ্য, ফল-ফলাদি, বনজ সম্পদ, হাঁস-মুরগী, মৎস সম্পদ, গবাদি-পশু অর্থ্যাৎ উপরে বর্ণিত যাবতীয় প্রত্যক্ষ কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ততার জন্যই। ন্যায্যত বার্ষিক জাতীয় আয়ের এ অংশটুকু অবশ্যই কৃষিখাতের আয়ের অংশ হিসেবেই বিবেচ্য। যেমন মনে করুন, কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য জল ও স্থলে পরিবহনের একটি অংশ আয় হয়, সে পরিমান আয় কি কৃষিখাত সংশ্লিষ্টতার জন্য নয়? যদি কৃষিকাজ বন্ধ করে দেয়া হতো পরিবহনের আয়ের ঐ অংশ কি "শূন্যে" এসে দাঁড়াতো না? নীচে প্রদত্ত ছকে কৃষি সংশ্লিষ্ট আয়ের এ বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। মোটকথা কৃষি ও কৃষিসম্পৃক্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে এদেশে অবিরাম একটি মহা আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ চলছে। আর এ কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত থাকে দেশের শতকরা প্রায় ৭৫% লোক। অর্থাৎ ১৭.৫০ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ১৩ কোটি লোক সার্বিকভাবে কৃষি অর্থনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত। কাজেই এটা অবধারিত যে একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে যেটি অর্থ আয়কারী খাত, বাংলাদেশে সেটি হলো কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাত। সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিক দেশগুলো এবং তাদের এদেশীয় পদলেহী মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া লুটেরা পুঁজিপতি ও আধাসামন্তীয় শাসক শোষকশ্রেণীর লোভাতুর দৃষ্টি সে দিকেই নিবদ্ধ থাকবে ।

<u>বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন(জিডিপি) ২০২১-২২ অর্থ বছরের উৎপাদন দর বিবেচনায় খাত সমূহের অবদান</u>

ক্র:	খাত	কোটি টাকায়	জিডিপিতে % ভাগ			মন্তব্য
			অকৃষিখাতে[%]	কৃষি বা কৃষিকাজের সংশ্লিষ্টতায় বিভিন্ন খাতের অবদান [%]	মোট[%]	
কক.	**কৃষি**	**৪,৪৫৫,৩১৩**	০০.০০	**১১.৬৬**	**১১.৬৬**	
১.	কৃষি,বনজ ও মৎস	৪,৪৫৫,৩১৩	০০.০০	১১.৬৬	১১.৬৬	
ক.	ফসল ও ফলজ	২,১৫৩,৬৫৩	০০.০০	০৫.৬৩	০৫.৬৩	আমরা শিল্প আয়ের যে ৩৫.২২% ভাগ পেয়েছি তার বিশদ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে সার, বীজ উৎপাদন, সেচ যন্ত্রাদি নির্মাণ, অটো রাইস ও হুইট ক্রাশিং মিল, কোল্ড স্টোরেজ, খাদ্যদ্রব্য পরিবহনের মালামাল নির্মাণ শিল্প, বিভিন্ন ফসল থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য বোতলজাতকরণ শিল্প
খ.	পশু পালন	৬৭৩,৯৮৬	০০.০০	০১.৭৭	০১.৭৭	
গ.	বনজ সম্পর্কিত	৬৩৭,৪৭৬	০০. ০০	০১.৬৭	০১.৬৭	
ঘ.	মৎস	৯৯০,১৯৮	০০.০০	০২.৫৯	০২.৫৯	
খখ.	**শিল্প**	**১৩,৪৭২,০৯৪**	**১৩.৮৩**	**২১.৩৯**	**৩৫.২২**	
২.	**খনন ও উত্তোলন**	**৫৮৯,১৬২**	০.৬৩	০.৯১	০১.৫৪	
২ক.	*প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল*	*১১৪,৯৩৭*	*০. ১০*	*০.২০*	*০.৩০*	
২খ.	*কয়লা ও অন্যান্য খনিজ*	*৪৭৪,২২৫*	*০. ৩৮*	*০.৮৬*	*০১.২৪*	

৩. ৩ক. ৩খ ৩গ.	**উৎপাদন** *বৃহৎ শিল্প* *ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অনুশিল্প* *হস্তশিল্প*	**৮,৬৪৪,৩৬৯** *৪,২২৮,৯৫৭* *২,৭৩৫,৮৬৮* *১,৬৭৯,৫৪৪*	০৭.৬০ *০৭.০০* *.৫৫* *০০.১০*	১৪.৯৮ *৪.০৭* *০৬.৬১* *০৪.৩০*	২২.৫৮ *১১.০৭* *০৭.১৬* *০৪.৪০*	ইত্যাদি থেকে আয় দাঁড়ায় ১১.০৭%। যা কৃষি বন্ধ করলে এ আয় সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে সেবা খাতের প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ করলে কৃষিখাতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জিডিপির পরিমান দাঁড়ায় প্রায়৬০%, যা ছকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এটা ২০২১-২২ অর্থ বছরের সরকারের বিবিএসের দেয়া হিসেবের ভিত্তিতে করা হয়েছে ।
৪. ৪ক. ৪খ.	বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ বিদ্যুৎ গ্যাস	৫০৪,১৩৫ ৪২০,৬২৪ ৮৩,৫১১	০.৫৫ ০.৩৫ ০.২০	০.৭৭ ০.৭৬ ০.০১	০১.৩২ ০১.১১ ০.২১	
৫.	**পানি সরবরাহ, পয় নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম**	**৩৮,০৯৪**	০.০৫	০.০৫	০.১০	
৬.	**নির্মাণ**	**৩,৬৯৬,৩৩৪**	০৫.০০	০৪.৬৮	০৯.৬৮	
গগ.	**সেবা**	**২০,২৭০,৮৭৯**	**২৬.২৬**	**২৬.৮১**	**৫৩.০৭**	
৭.	পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়: মোটরগাড়ী ও মোটরসাইকেল মেরামত	৫,৬৭০,৯৬৯	০৪.৮৫	১০.০০	১৪.৮৫	
৮. ৮ক. ৮খ. ৮গ. ৮ঘ. ৮ঙ.	***যান ও গুদাম ব্যবস্থাপনা*** *স্থল যান* *জলযান* *আকাশ যান* *গুদাম ঘর ও সংশ্লিষ্ট সাপোর্ট* *ডাক ও কুরিয়ার সেবা*	*২,৮৫২,৭১৫* *২,৫৩৪,২৯৪* *১৮৪,১৮৭* *২৪,২১৯* *৯৪,৪৫১* *১৫,৫৬৬*	৩.১০ *০৩.০০* *০.০২* *০.০৫* *০.০২* *০.০১*	*৪.৩৭* *৩.৬৩* *০.৪৬* *০.০১* *০.২৩* *০.০৩*	*০৭.৪৭* *০৬.৬৩* *০.৪৮* *০.০৬* *০.২৫* *০.০৪*	
৯.	হোটেল ও রেস্তোরা	৪৪৪,৫১৫	০.৫০	০.৬৬	০১.১৬	
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ	৪১৪,২২২	০.৫০	০.৫৮	০১.০৮	
১১. ১১ক. ১১খ. ১১গ.	আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম *অর্থ ব্যবস্থাপনা [ব্যাঙ্ক]* *বীমা* *অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা*	১,২৯৫,৩৯০ *১,১০৮,৭৮০* *১০৫,৫৬২* *৮১,০৪৮*	০২.২৮ *০১.৯০* *০.১৮* *০.২০*	০১.১১ *০১.০০* *০.১০* *০.০১*	০৩.৩৯ *০২.৯০* *০.২৮* *০.২১*	
১২.	আবাসন খাত কার্যক্রম	৩,৪০১,৮১৬	০৭.০০	০১.৯১	০৮.৯১	

১৩.	বিজ্ঞান, কারিগরী ও পেশাগত কার্যক্রম	৬৯,৪২০	০.০৩	০.১৫	০.১৮	
১৪.	প্রশাসনিক ও সহায়তাকারী কার্যক্রম	৩১১,৩৬২	০.৪২	০.৪০	০.৮২	
১৫.	জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা	১,২৭৩,৬৬০	০৩.০০	০.৩৩	০৩.৩৩	
১৬.	শিক্ষা	১,০৯৫,১৩৮	০১.০০	১.৮৭	০২.৮৭	
১৭.	জনস্বাস্থ্য ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম	১,৩৮২,০৬৯	০১.৪৮	২.১৪	০৩.৬২	
১৮.	শিল্প, প্রণোদনা ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম	৬০,৭৩৭	০.১০	০.০৬	০.১৬	
১৯.	অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম	১,৯৯৮,৮৬৪	০২.০০	০৩.২৩	০৫.২৩	
২০.	বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) উৎপাদন দরে	**৩৮,১৯৮,২৮৬**	**৪১.৬২**	**৫৮.৩৮**	**১০০**	

৪. বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লব!

কৃষিতে বহুজাতিকের মুনাফার স্বার্থে ৬০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও "সবুজ বিপ্লব" চাপিয়ে দেয়া হয়। এই সবুজ বিপ্লবের নাম করে এদেশের কৃষি ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক হস্তক্ষেপ করা হয়। সবুজ বিপ্লবের বিভিন্ন উপাদানের ফলে দেশের পরিবেশ, মাটির উর্বরতা ও জীববৈচিত্রের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেটি একটি দীর্ঘ আলোচনা। এই সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমেই এখানে একক শস্য চাষাবাদের প্রচলন হয় এবং এ মাধ্যমেই এদেশের কৃষিব্যবস্থা বাজারের সাথে সম্পৃক্তকরণ বৃদ্ধি পায়। কৃষিখাতের প্রয়োজনীয় নির্ধারক সিদ্ধান্তগুলো বাজারের হাতে ছাড়া শুরু হয় ।

১৯৮২-৯০ এর দশকে বাংলাদেশে কৃষিখাতে ব্যাপক মাত্রায় সংস্কার সাধন শুরু হয় । কৃষি কাঁচামাল বাজারজাত ও বণ্টনব্যবস্থা বেসরকারী হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। খাদ্য বাণিজ্যও বেসরকারী হাতে ছাড়া হয়। কৃষির আমদানী ও রফতানীতে শুল্কহার কমানো হয়। পূর্বে এক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব ছিলো রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিএডিসির। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও দ্রুততার সাথে কৃষিতে নয়া উদারবাদী সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন করেছে।

১৯৮২ সালের জুন মাস পর্যন্ত সারের দামের উপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিলো। পূর্বে সার ও সেচ যন্ত্র বণ্টনে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিএডিসির দায়িত্বে ছিলো। ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত বিএডিসি নিজেই গভীর নলকূপ ও লো-লিফ্‌ট পাম্প ভাড়া দিত । ১৯৮৩ সালের জুলাই মাস থেকে সারা দেশে সারের দামের উপর থেকে নিয়ন্ত্রন তুলে নেয়া হয়। সার ও সেচযন্ত্রের বণ্টনব্যবস্থা বেসরকারী হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। অগভীর নলকূপ শুরু থেকেই বেসরকারীভাবে ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হতো। আর ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে গভীর নলকূপ ও লো-লিফ্‌ট পাম্পও বিক্রী করা শুরু হলো। এগুলো কিনলেন গ্রামের নতুন শ্রেণীর উদ্যোক্তারা, কৃষির বিকাশের চাইতে দ্রুত টাকা কামিয়ে অন্যত্র টাকা খাটানোই ছিলো যাঁদের উদ্দেশ্য। সেচ যন্ত্রের বিক্রি বেড়ে যাওয়াতে এগুলোর ভাড়ার হার বাড়ানো হলো কয়েকবার। ১৯৮১-৮২ সালে যেখানে ভাড়ার হার ছিলো ৮১,২০০/০০ টাকা, ১৯৮৩-৮৪ সালে সেখান থেকে একলাফে তা বাড়িয়ে করা হলো ৮৫,০০০/০০ টাকা। এর ফলে কৃষকের সেচ খরচ যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে তাঁর ধান উৎপাদন খরচও অনেক বেড়ে যায় ।

কৃষিতে নয়া উদারাবাদী সংস্কার নীতি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বৈষম্য প্রকটভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সার ও সেচব্যবস্থা স্থানীয় ক্ষমতাশালী ও ধনীলোকদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। সারের ডিলারদের প্রায় ৯৫% ও সেচ যন্ত্রের মালিক কিংবা উদ্যোক্তাদের ৫০% বেশি জমির মালিক। অন্যদিকে ডিলার ও সেচযন্ত্রের মালিকদের মধ্যে ৫০% হচ্ছেন স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা।

৫.কিন্তু আসলে কী ঘটেছে?

শোষক শ্রেণী বহুমূখী এবং অতিরিক্ত শোষণ দ্বারা বর্ধিত উৎপাদন লুণ্ঠন করে নেয়। এ ছাড়া বর্ধিত শোষণের প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ফসলের দাম হ্রাস করা হয়। ফলে একদিকে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায় এবং সাথে সাথে উৎপাদন আয় কমে যায়। এতে কৃষি উৎপাদনে প্রণোদনা কমে যায়। নীচে ভূমি মালিকানার একটি পরিসংখ্যান (হোসেন ও বায়েস, ২০০৯ ইংরেজী) দেয়া হলোঃ

বিষয়	১৯৮৮ ইং	২০০০ ইং	২০০৮ ইং
ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা	৩৫	৩৪	২৯
কার্য্যত ভূমিহীন (০.৫ একর পর্য্যন্ত)	৪৭	৫০	৫৯
বড় কৃষক (৫.০০ একর পর্য্যন্ত)	৮	২৯	৩.২
ছোট প্রান্তিক কৃষক (০.৪ থেকে ২ একর পর্য্যন্ত)	৩২	২৯	২৫
জমির গড় আয়তন (হা)	০.৬১	০.৫৩	০.৪৮

প্রায় ৬২% জমি চাষ করে ছোট কৃষক (০.৪-২ হা) এবং তাঁদের চাষকৃত জমি যা ১৯৬০ সালে ছিলো ৩৯% তা ১৯৮৩-৮৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯%। খাঁটি ভাগচাষী ও ভাগচাষী মালিক কৃষকের সংখ্যা ১৯৮৮ সালে যা ছিলো ২৮% তা ২০০৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪১%-এ। আর এই সময়ে খাঁটি ভাগচাষীর সংখ্যা দ্বিগুন হয়েছে। হোসেন ও বায়েসের ২০০৯ সালে প্রকাশিত লংগিটিউজেনাল রিপোর্টে ও গৃহশুমারীর তথ্য দিয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ভাগচাষ প্রথায় জমি পত্তনের বিস্তৃতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী এই সময়ে ভাগচাষ পত্তন জমির পরিমান ১৩% থেকে ২৮% -এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. ভূমি সংস্কার প্রয়োজন কেন?

আমাদের দেখতে হবে সবুজ বিপ্লবে ভূমি মালিকানার কোনরূপ পরিবর্তন হয়েছে কিনা! নাকি এটি একটি উল্টো পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জমি হারিয়ে ভূমিহীনরা কিন্তু সর্বহারা হয় না, ভাগচাষীই থেকে যায়। সামন্তবাদকে না ভেঙে একে আধাসামন্তবাদী অবস্থায় জিইয়ে রেখে একে অবলম্বন করে, কৃষির উন্নয়ন, বনজ সম্পদ, হাঁস-মুরগী, মৎস সম্পদ, গো-ছাগল, নদী ও পানি ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণের ও আধুনিকায়নের কথা বলে সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এ খাতে কীটনাশক, সার, বীজ, সেচ সম্প্রসারণের নামে সেচের যন্ত্রপাতি লুম্পেন ও ফড়িয়াদের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক পন্থায় সাম্রাজ্যবাদী ও মুৎসুদ্দী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সামন্তবাদী গ্রামীণ লুম্পেন গোষ্ঠীটিকেও তার উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। আধাসামন্ত প্রভু ও লুম্পেন ফড়িয়াদের এভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের শক্তিহীন করে সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের মূখ্য অর্থকরী খাত কৃষিখাতে তার সৃদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই ধারাবাহিকতায় ও এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্রামীণ শ্রমজীবী কৃষক ভাইয়েরা সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের এক দানবীয় নিষ্ঠুর শোষণে জর্জরিত হচ্ছে। সমস্ত কৃষি উপকরণসহ, সেচ ব্যবস্থাপনা, সার, বীজ, সেচের জন্য বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, ভূমিহীন, ক্ষুদে, মাঝারি এমনকি ধনী কৃষকরাও এ নির্মম শোষণে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় কৃষি পণ্যসহ অর্থকরী যাবতীয় গ্রামীণ ফসলের বাজার ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় শাসনের আনুকূল্যে লুম্পেন বুর্জোয়া ও ফড়িয়ারা নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই আমরা দেখি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেমন কৃষি শ্রমিকদের কম মজুরি দেয়া হচ্ছে, আবার যেসব ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিতে ইজারা/ বর্গাপ্রথায় চাষাবাদ করানো হচ্ছে, কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্য ও ফসল উৎপাদন মূল্য থেকে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা নিয়ত দেখি উৎপাদন মূল্য থেকে কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করায় কৃষকভাইয়েরা রাগে, দুঃখে তাঁদের উৎপাদিত টমেটো, আলু, বেগুন, ফুলকপি, পাতাকপি গাড়ীর চাকার নীচে, নদীর পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এতে ভূমির উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন ধরনের উন্নয়ন তো আসেই নি বরং কৃষিতে নির্ভরশীল পরিবার ও কৃষক ভাইদের আর্থিক অবস্থা প্রতিদিন আরো সংকটময় হয়ে উঠেছে। তাতে ফি-বছর ছিন্নমূল কৃষি শ্রমিক ভাইয়েরা বাঁচার তাগিদে শহরে এসে ছিন্নমূল ভাসমান সর্বহারায় রূপান্তরিত হচ্ছে। শহরে গিয়ে এ ছিন্নমূল শ্রমিকেরা কাজ পেয়ে কি উদোর ভরে অন্ন খেতে পারছে ? যে খাতে এদের অধিকাংশ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে মানবেতর জীবন পালন করছে, বুর্জোয়াদের দৃষ্টিতে বিবেচ্য সেরা সেই "পোশাক" খাতের উপর আমরা এবার একটু ত্বরিৎ চোখ বুলিয়ে নেই।

৭. বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প

আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ এ খাতে হঠাৎ গজানো মালিক গোষ্ঠী লুটেরা লুম্পেন বুর্জোয়াদের নিষ্ঠুর শোষণের কৌশল যেমন কথিত আছে, তেমনি আছে অসহায় শ্রমিকদের নিপীড়িণের করুন গাথা। গার্মেন্টস শিল্পে একজন শ্রমিক সারাদিনমান অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও বেতন দেয়া হয় শুধু ঐটুকুনই যা দিয়ে সে খাদ্য কিনে আর ঐ কয়টা দিন বেঁচে থাকবে শুধু তার "প্রভু"র বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড়টি ঠিকমতো সেলাই করে আরো মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এই পোশাক শিল্প যাকে নিয়ে এতো হৈচৈ, প্রকৃত জি,ডি,পি-তে তার সংযোজন কত? বিদেশী ক্রেতা এবং আমাদের লুম্পেন মালিকরা যৌথভাবে আমাদের শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত মূল্য শুধু নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠনই করছে না, শর্তানুযায়ী বিদেশী ফ্যাব্রিক্স সহ আরও অনেক মালামাল বিদেশ থেকে আমদানী করে আনার ফলে আমাদের ঐ সব দেশীয় শিল্পও ইতোমধ্যে ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। হিসেব করলে দেখা যাবে যে ফ্যাব্রিক্সের প্রায় ৭০ শতাংশ বিদেশী ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী বিদেশ থেকেই কিনতে হয় বিধায় প্রকৃত অর্থে আমাদের গার্মেন্টস মালিকদের ধনিক দেশের পোশাক ক্রেতাদের ঠিকাদার ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা যায় না। এরা প্রকৃত অর্থে বিদেশ থেকে কাপড় কিনে তা সেলাই করবার জন্যে শ্রমিক নিয়োগের ঠিকা নেয়। এদেরকে কোন যুক্তিতে শিল্পপতি বলা হবে? এরা কি সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিক দেশের নিয়োজিত শ্রমিক নিয়োগের ঠিকাদার নয়? যদিও ঝুঁট সংক্রান্ত কিছু ব্যবসা, কিছু কিছু এক্সসেসরিজ নির্মাণের জন্য ছোট ছোট কিছু বাণিজ্য ও কারখানা গড়ে উঠেছে বটে কিন্তু দেশের সার্বিক ফ্যাব্রিক্স খাত, যা একটা মৌলিক শিল্প তা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে, ঐ সব খাতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে। তার বিনিময়ে ৩৫০০ লুটেরা লুম্পেন বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত একদল ঠিকাদারী ফটকা ব্যবসায়ী অবৈধ বিত্তের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। যারা নিজেদেরকে "শিল্পপতি" বলে দাবী করছে এবং শিল্পপতির নাম ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় অবৈধ সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে ।

৮. সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত সংস্কৃতির বাহক লুটেরা মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া ও আধাসামন্তবাদী শ্রেণী এদেশের শত্রু

একই সাথে আজকে কৃষির এ বিপর্যয়ে সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার পদলেহীদের দ্বারা অপকৌশলে নদী-খাল-জলাশয় দখল করে জলপ্রবাহ বন্ধ করে স্বাভাবিক ও সাশ্রয়ী সেচ বন্ধ করে গভীর নলকূপ বসানোর লক্ষ্যে "অপ্রয়োজনীয়" বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর, ডিজেল, সার, বীজ বিক্রির ফন্দি-ফিকির বাস্তবায়ন করে কৃষি উৎপাদন ব্যয় অনেক বাড়িয়েছে। গভীর নলকূপ দিয়ে পানি তোলার ফলে পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে জমির উর্বরতা বিলীন হওয়াসহ এক ভয়ানক আর্সেনিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের কৃষি খাতকে সার, বীজ, সেচ যন্ত্রপাতি ও আমদানী নির্ভর জ্বালানীর উপর এক অনৈতিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছে, তেমনি আর্সেনিক সংকট সৃষ্টি করে শুধু গ্রামীণ জনগণের কর্মদক্ষতাই হ্রাস করেনি, এ সংকট সমাধানের নামে পরামর্শক, ঔষধের ব্যবসার পসরাও বসিয়েছে। আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এ সাপ হয়ে দংশন আর ওঝা হয়ে ঝাঁড়ার নীলনকশার বিরুদ্ধে যতোদিন এদেশের কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবাসহ নিপীড়িত জনগণ একাট্টা হয়ে এক জনযুদ্ধ সৃষ্টি করতে না পারবে ততদিন এদেশের জনগণ এ নিষ্ঠুর শোষণ থেকে কিছুতেই মুক্তি পেতে পারে না ।

কাজেই এটা হিসেব থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিই হচ্ছে এদেশে প্রধান আয়করী খাত। আর এ থেকে এও প্রতীয়মান হচ্ছে যে কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই যে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য কৃষি ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করে ভূমি ব্যবস্থার এ আধাসামন্তবাদকে ভেঙ্গে চুরমার করে কৃষি ব্যবস্থার এক আমূল সংস্কার করার এক সুতীব্র শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। তখন শুধু কৃষকেরাই মুক্তি পাবে না, এ দেশ, ছাত্র-যুবা-নিপীড়িত মেহনতি জনতাও এক নিষ্ঠুর শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। আর তখন এ দেশে কায়েম হবে একটি সত্যিকার স্বাধীন গণতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। এ আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে "লাঙ্গল যার, জমি তার" এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে সমস্ত কৃষি ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে সমবায়ের আওতায় আনলে যেমন সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে হটানো যাবে, তেমনি আধাসামন্তবাদকে তাড়িয়ে বর্ণাঢ্য অর্থনীতির এক নতুন বাংলাদেশের সৃষ্টি করা যাবে।

কমরেড চারু মজুমদার ও তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষা

সৌভিক রেজা

কার্তেজীয় পদ্ধতির জন্যে যিনি সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত, সেই ফরাসি দার্শনিক র‍্যেনে দেকার্ত মনে করতেন, মানুষের 'শুভবুদ্ধি থাকাটাই যথেষ্ট নয়, আসল হচ্ছে সেটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারা।' কথাটির গুরুত্ব সবার কাছে হয়তো একরকম নয়, তবে এই উপমহাদেশে একজন মানুষের গোটা জীবনের মধ্যে দিয়ে সেইটি মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলো। তিনি হলেন কমরেড চারু মজুমদার।

৫ ই জুলাই, ১৯৬৭ সালে চিনের 'পিপলস ডেইলি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলো, 'প্রচণ্ড গর্জনে ভারতের বুকে ধ্বনিত হয়েছে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। দার্জিলিং অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক লাল এলাকা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে এটি এক প্রচণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ।' এই বিকাশ সেদিন সম্ভব হয়েছিলো কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে, যাঁর হাত ধরে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান রণকৌশলগতভাবে একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিলো। যে-মতাদর্শ তাঁকে পথ চিনিয়ে দিতে পেরেছিলো, সেটি হচ্ছে— মার্কসবাদ।

২.

এই যে আজ নকশালবাড়ি আর চারু মজুমদার সমার্থক হয়ে উঠেছে, এর প্রধান কারণ কী?— এই প্রশ্নে অনেকেই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। খুব সহজ আর অল্প কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন, তারপরও যদি দিতেই হয়, তাহলে বলা দরকার যে, চারু মজুমদার ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি কমরেড মাও সে-তুঙের মতাদর্শকে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে একেবারে সামনে টেনে এনেছিলেন। যাকে বলা যায়, নির্ভুল চিন্তাধারা, চারু মজুমদার, সেই শিক্ষাটাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে?'— মাও সে-তুঙ ভারি চমৎকারভাবে এর জবাবে বলেছিলেন, 'মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কেবলমাত্র সামাজিক অনুশীলন থেকেই আসে।' তাঁর কথাটিকে আরও খানিকটা ব্যাখ্যা করে মাও জানিয়েছিলেন, 'সমাজের উৎপাদন সংগ্রাম, শ্রেণিসংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা— এই তিনটা অনুশীলন থেকেই সেগুলো আসে।' এই যে আয়ত্তে আনা, এটি চারু মজুমদারের বিখ্যাত 'আটটি দলিলে'র মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। প্রথম দলিলের শেষাংশে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক শিক্ষা কী হবে, সে-সম্পর্কে তিনি বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন, 'ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে হচ্ছে কৃষি বিপ্লব। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য হবে— কৃষি বিপ্লব সফল কর।' শুধুই তা-ই নয়, সেইসঙ্গে চারু মজুমদার জানাতে ভোলেননি যে, 'কৃষি বিপ্লবের কার্যক্রমকে আমরা যতখানি শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রচার করতে ও তাঁদের শিক্ষিত করে তুলতে পারবো, ততোখানি তাঁরা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবেন।' আর রাজনৈতিক শিক্ষিতজনেরা গোটা দুনিয়ায় কীভাবে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেন, সেটি রাশিয়ায় কমরেড ভ. ই. লেনিন যেমন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি কমরেড মাও দেখিয়েছিলেন তৎকালীন চীনে। ভারতবর্ষের মাটিতে কমরেড চারু মজুমদার সেই একই আগুন জ্বালানোর প্রচেষ্টায় অংশ নিয়েছিলেন।

৩.

এটা তো ঠিক যে কমরেড চারু মজুমদার সশস্ত্র সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রক্তপাত অনিবার্য। আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো সেখানেও, রক্তপাত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। একজন মা যখন সন্তানের জন্ম দেন, তখন তাঁর রক্তপাত কেউই ঠেকাতে পারে না। এই রক্তপাত হচ্ছে একটি ইতিবাচক রক্তপাত, জীবনের জন্যে রক্তপাত। যে-নারীর প্রতিমাসে রক্তপাত হয় না, বুঝতে হবে তাঁর সন্তান ধারণের ক্ষমতা আর নেই।

কমরেড মাওয়ের মতে বিপ্লব হচ্ছে, সক্রিয়তার সঙ্গে শোষক শ্রেণিকে উৎখাত করা। সমাজের ৯৯%-এর ক্ষমতা ও সম্পদ যখন ১% শোষক শ্রেণির হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে, তখন তারাও তো বাধা প্রদান করবেই করবে। সেই বাধা প্রতিরোধ করবার শক্তি ও সামর্থ্য যদি বিপ্লবীদের না-থাকে, তাহলে তো বিপ্লব প্রাথমিক পর্যায়েই পরাস্ত হতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে খতমের রাজনীতির প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে। খুবই ভুলভাবে কমরেড চারু মজুমদারের খতমের রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা হয়। অথচ কমরেড চারু মজুমদার দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, খতমের রাজনীতি মানে শুধুই 'ব্যক্তিকে খতম করা নয়।' সেই শত্রুটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকেও খতম করা।'

৪.
কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, 'অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু নির্ধারক উপাদান নয়।' তাহলে নির্ধারক উপাদান কোনটি বা কারা? মাওয়ের মতে, 'নির্ধারক উপাদান হচ্ছে মানুষ, বস্তু নয়।' তিনি জনগণের শক্তিকে কতোটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেটি তাঁর এই কথা থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি। মাও বলেছিলেন, 'জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টির চালক-শক্তি।' শুধু এইটুকুতেই থামেননি তিনি, এ-ও বলেছিলেন যে, 'জনসাধারণ হচ্ছেন প্রকৃত বীর'।

কেন জনসাধারণ প্রকৃত বীর?— মাওয়ের মতে, এই জনসাধারণের মধ্যেই আছে 'সীমাহীন সৃজনী শক্তি'। কমরেড চারু মজুমদার সেই জনগণের সৃজনী শক্তির উপর এরচেয়ে কোনো অংশে কম ভরসা করেননি কখনো। তিনি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, 'শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারাটাই কমিউনিস্ট হবার একমাত্র মাপকাঠি নয়।' 'কে প্রকৃত কমিউনিস্ট?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চারু মজুমদার জানিয়েছিলেন, 'যিনি জনগণের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারেন এবং এই আত্মত্যাগ বিনিময়ের কোনো প্রত্যাশা করে নয়।' এসবের পাশাপাশি কোনো রকম ছাড় না-দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'দুটো পথ— হয় আত্মত্যাগ, নয় আত্মস্বার্থ। মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই।' জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব যে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কোনোভাবেই পৌঁছোতে পারে না, সেটি চারু মজুমদার তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকেই শিখেছিলেন। তাঁর সহযোদ্ধাদেরকেও সেই শিক্ষাটাই তিনি দিতে চেয়েছেন।

৫.
উপমহাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির ক্ষেত্রে কমরেড চারু মজুমদারের আরও একটি বড়ো শিক্ষা এই যে, সংশোধনবাদকে চিহ্নিত করা এবং সেটির বিরুদ্ধে নিরন্তর ও আপোসহীন সংগ্রাম করে যাওয়া। সংশোধনবাদ কী? সংশোধনবাদ কখনোই একটি রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করতে চায় না। সে অতীতের সংগ্রাম এবং সংগ্রামের ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা নেয় না। একইসঙ্গে বিপ্লবী লক্ষ্য, আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে অর্থনীতিবাদকেই বড়ো করে দেখে ও দেখায়।

এসবের বিপরীতে, নকশালবাড়ির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে, কমরেড চারু মজুমদার বলেছিলেন, 'এই প্রথম কৃষক শুধু তার ছোট দাবির জন্য আন্দোলন করলেন না, তিনি আন্দোলন করলেন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য।' নিজের এই বক্তব্যকে আরও খানিকটা বিস্তারে নিয়ে গিয়ে চারু মজুমদার জানিয়েছেন, 'নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন থেকে যদি অভিজ্ঞতা নিতে হয়, তবে সে অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, জমি বা ফসল ইত্যাদির জন্য জঙ্গী সংগ্রাম নয়। জঙ্গী সংগ্রাম করতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য।' তাঁর মতে এখানেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের নতুনত্ব। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কমরেড চারু মজুমদারের এই মূল্যায়নকে কোনোভাবেই অস্বীকার করবার উপায় নেই।

৬.
কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, 'আমাদের প্রয়োজন হলো উৎসাহী কিন্তু স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির। উত্তেজনাময় কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজের।' কমরেড চারু মজুমদার ছিলেন মাওয়ের সেই উৎসাহী ও স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির অধিকারী একজন মানুষ। যিনি একইসঙ্গে উত্তেজনা আর শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা করতে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের মাটিতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ আর বিপ্লবের গানকে একইসূত্রে মেলাতে পেরেছিলেন। কতোটা সফল হয়েছিলেন, সেই প্রশ্নটিও উঠবে, উঠতে বাধ্য। কারণ সেটিকে অস্বীকার করে আজ এক পাও অগ্রসর হওয়া যাবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা
কানন চৌধুরী

বিস্তীর্ণ পাহাড়ে এখনও ভয় আর শঙ্কায় দিনাতিপাত করছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ। লংগদুর ও লোগাংয়ের গণহত্যার বিষবাষ্প এখনও প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেগুন, রাবার, চা আর তামাক গাছের হাওয়ায়। পাহাড়ের ভগ্নস্তুপে পুনরায় যারা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে নিজেদের মাটি। তারা প্রতিরাতে শঙ্কা নিয়ে ঘুমায়, আবার জাগে একই ভয়ে। আবাদযোগ্য ভূমি নেই তাই সস্তা শ্রম বিক্রি করতে ছুটে যাচ্ছে শহরে, তবু বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের হুমকি। স্থানীয় প্রশাসন, সরকার প্রতিনিধি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রত্যেকে মিলে যে চক্রবূহ্য রচনা করেছে, যে চক্রবূহ্যকে ক্রমাগত আগ্রাসী ও শক্তিশালী করে তুলছে মিলিটারি ক্ষমতা, যার ঢাল হয়ে আছে সেটেলার বাঙালী। এমন এক চক্রবূহ্য। তাকে ভেদ করে এমন সাধ্য কি নেই পাহাড়ের জনতার? পাহাড়ের ত্রাস, অগ্নিসন্ত্রাস, গণহত্যা সবকিছুই যখন স্পষ্টত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নমুনা তখন এই সন্ত্রাসের প্রতিরোধে জনগণের বিপ্লবী চেতনার যথার্থ স্ফুলিঙ্গ বাস্তবিক এখন আর দেদীপ্যমান নয়। কেন? পাহাড়ের জনগণের চাওয়া-পাওয়ার সাথে মিলবে এমন ঐক্য আর নেই? নাকি চাওয়া-পাওয়া এখন বিবিধ? পাহাড়ের জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে আর এগিয়ে যেতে পারছে না পাহাড়ের মুক্তিকামী যোদ্ধারা? তাদের পার্টিগুলো কি আর প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না পাহাড়ের জনগণের? নাকি রাষ্ট্রের বিভাজন এবং শাসনের কৌশলে তারা আটকা পড়েছে? পাহাড়ের জনগণ এখন আন্তঃজাতিস্বার্থ নিয়ে বেশি চিন্তিত? নাকি আন্তঃজাতিদ্বন্দ্বের পাতানো রাষ্ট্রীয় ফাঁদে আটকা পড়ছেন তারা? পাহাড়ের নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যে আন্তঃসংঘর্ষ কি আদৌ সত্যি ঘটনা? পাহাড়ের জনগণ কি আন্তঃবিরোধকে সমর্থন করে? এই বিরোধ কি তাদের কাছে প্রধান?

অজস্র ঘটনা, তার বিবিধ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিজাত মীমাংসা হাজির হচ্ছে আমাদের সামনে। কিন্তু প্রকৃত জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। অবধারিতভাবেই একটি সংগ্রামী এলাকায় অসংখ্য পথ-মতের সংগ্রাম জারি থাকবে। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বও হবে। আর এভাবে সংগ্রামের বিকাশ। এ-ই বিকাশের শর্ত। এই আন্তঃদ্বন্দ্ব বা আন্তঃসংগ্রামের ভেতর দিয়েই ঐক্য, বিরোধ, পুনঃঐক্য ইত্যাদি সংগঠিত হবে। পথ-মতের সাথে মত-পথের বিতর্কেই নতুন পথ-মতের সৃষ্টি হবে। অন্তত জনগণের সংগ্রাম বা যুদ্ধের বা দৈনন্দিন টিকে থাকার লড়াইয়ের এই হচ্ছে সারাৎসার। পাহাড়ের জনগণ নিজেদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেন। পাহাড়ের জনগণের কাছে তার নিজস্ব জাতির পরিচয় তাকে পাহাড়ের নিপীড়িত জাতিগুলোর সাথে আরো ঐক্যবদ্ধ করে তোলে, বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এমন ধোঁয়া তুলে বরং এই বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত গ্রাউন্ড নির্মানের ছক কষা হচ্ছে। যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পক্ষে যাবে। এই বিচ্ছিন্নতার প্রচারক বুদ্ধিজীবীরা হয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দালাল কিংবা আপোষকামী অথবা বিষয়টিকে তারা পাহাড়ের মুক্তিকামী জনতার লড়াইয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারছেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ভূমি ও অধিকার হরণের লক্ষ্যে এই রাষ্ট্রযন্ত্র পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে উদ্বাস্তু বাঙালিদের। এক শোষিত মানুষের বিপরীতে আরেক বঞ্চিত মানুষকে দাঁড় করিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে রাষ্ট্র হত্যা করেছে শতসহস্র মানুষ। শোষিত বঞ্চিত ভাগ্যাহত মানুষের এই হচ্ছে নির্মম পরিণতি। শৃঙ্খলার অজুহাতে রাষ্ট্র জারি করলো সেনাশাসন। মানুষের সর্বশেষ স্বাধীন চলাচলও সেনার দখলে। আবাদযোগ্য ভূমি, বাস্তুভূমি একে একে দখল হতে থাকল। আজও। এই মুহূর্তেও। পাহাড়ের এই শোষিত নিপীড়িত জাতির জনতারা তাদের মুক্তির লক্ষ্যেই হাতে অস্ত্র নিয়েছে। তবে কি ব্যর্থ এই প্রতিরোধ সংগ্রাম? পাহাড়ের দখলদারদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আর তার সহচর দালাল সেটেলাররা যে লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগ করে আসছে তার ঢাল করে রেখেছে আরেক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে। প্রতিরোধ সংগ্রামে বেঁধে গেছে দাঙ্গা। শোষিত বনাম শোষিতদের দাঁড় করিয়ে নির্বিঘ্নে রাষ্ট্র দখলকার্য করে গেছে এতকাল। এখনো। আদিবাসী জনগণ তার ভূমি দখলদার যে বাঙালি সেটেলারকে চেনে এবং প্রতিরোধের চেষ্টা করে, কিন্তু এই দখলদারির ক্ষমতার উৎস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সে প্রত্যাঘাত করতে সচেষ্ট নয়। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি তার দালালদের দিয়ে দখল করছে ভূমি অথচ এই ক্ষমতাসীনরা নির্বিঘ্নে ভাষণ আর বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে ময়দানে। পোস্টারে ব্যানারে ছেয়ে যাচ্ছে বাজার, হাট, পৌরশহর থেকে ইউনিয়ন পরিষদগুলো। গ্রামে গ্রামে, যাত্রী ছাউনি, চায়ের দোকান সর্বত্র। একদিকে দখল হচ্ছে আবাসভূমি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের দ্বারা, অন্যদিকে সেনাবাহিনী দখল করছে তার ক্যাম্পের নামে, পর্যটনের নামে, পাঁচ তারকা হোটেলের নামে। আর পাহাড়ি জনগণকে বোঝানো হয়েছে শত্রু সমস্ত বাঙালিরা। বাঁধানো হয়েছে দাঙ্গা। দেখানো হয়েছে ভুল শত্রুর মুখ। নিরস্ত্র বনাম নিরস্ত্র। দাঙ্গা বাঁধাতে ভূমিকা রেখেছে রাষ্ট্রের অস্ত্র। নিরন্তর শোক, রক্ত, আগুন আর হত্যার ভূমি হয়ে উঠেছে সবুজ পাহাড়। পাহাড়ি জনগণ তার বসতির পাশের যে সেটেলারকে জেনেছে শত্রু বলে সে সেটেলারের সাথে তার দ্বন্দ্ব সত্য, কিন্তু প্রকৃত শত্রু যে দখল করিয়েছে। রাষ্ট্রের দখল উৎসবে সেনা, প্রশাসন, আমলা, মুৎসুদ্দী, দখলদার জনপ্রতিনিধি এরা সবাই যেমন শত্রু তেমনি শত্রু এই সেটেলারদের মধ্যেকার দালাল ও

লুটেরা সুবিধাভোগি মাস্তান লুম্পেনরা। এদের আক্রমণের ভেতর দিয়েই পাহাড়ে মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। এদের প্রতিহত করার ভেতর দিয়েই পাহাড়ের জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তি প্রতিহত করবে পাহাড়ের শত্রুদের। একইভাবে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে পাহাড়ের নিপীড়িত জনগণকে সমগ্র দেশের মুক্তিকামী বঞ্চিত নিপীড়িত শ্রেণী জাতি ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। তাই নিজের জাতি ও অপরাপর নিপীড়িত জাতির ইতিহাস সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তেমনি গোটা দেশের সংগ্রামের ইতিহাসে সামিল হতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি ঘটনা [২][৪][৫]

১৮৬০– পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হয়।

১৮৮১– পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়। চাকমা রানী কালিন্দী এই ভাগের বিরুদ্ধে আপিল করেন কিন্তু তা গৃহীত হয়নি।

১৯০০– Chittagong hill tracts regulation acts জারি করা হয়।

১৯৪৭– পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অংশ করা হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ পূর্ব-ভারতের রাজ্যসমূহের সাথে confederation গঠনের দাবী জানান এবং দাবী ব্যর্থ হয়।

১৯৫৮-৬২– কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হয়। প্রায় ৪০% আবাদযোগ্য জমি (৫৪ হাজার একর) পানিতে তলিয়ে যায়। প্রায় লক্ষাধিক আদিবাসী বাস্তুহারা হয়।

১৯৬৩– পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ এলাকার মর্যাদা বাতিল করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বা মূল রাজনৈতিক সংকটের পরিচয় পেতে এর ইতিহাসকে কাপ্তাই বাঁধ ও তার আগে পরের ইতিহাসের মূল্যায়নের ভেতর দিয়ে বোঝা যাবে। যদিও আদিবাসী, উপজাতি ও নৃগোষ্ঠি বিতর্কে উপনিবেশ ও তার আগে পরের ইতিহাস নিয়ে বহু আলোচোনা সমালোচনা হতেই পারে। কিন্তু এই বিতর্ক যখন উত্থাপিত হয় সেনাশাসন প্রসঙ্গে তখন তা প্রকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর চলমান শোষণকে পাশ কাটানোর চক্রান্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম indigenous এরিয়া হোক বা tribal কোনোভাবেই সেখানে সেনাশাসন থাকতে পারেনা।

	মোট	সমতলে %	পার্বত্য চট্টগ্রামে %
ভূমি	১৪৭৫৭০	৯১	৯
জনসংখ্যা	১৪০০০০০০	৯৯	১
সেনা	১২০০০০	৬৬.৬	৩৩.৪
২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যমতে [১]			

সমতলে ১জন সেনা প্রতি ১৭৫০ জন সিভিলিয়ানের বিপরীতে আর পাহাড়ে ১জন সেনা প্রতি ৪০জন সিভিলিয়ানের বিপরীতে। [১] আর প্রায় অর্ধেক বাঙালী বাদ দিলে প্রায় ২০ জন পাহাড়ী আদিবাসীর বিপরীতে ১জন সেনা।

২০১১ এর তথ্যমতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪৮টি আর্মি ক্যাম্প ১২৮টি বিজিবি ক্যাম্প ১০৬টি পুলিশ আনসার ও অন্যান্য ক্যাম্প। [১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের ২০০ বছরের ইতিহাসে কাপ্তাই বাঁধ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অন্তত পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান দীর্ঘদিনের সংকটের আদি কারণ হিসেবে এই কাপ্তাই বাঁধকে দেখা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব জানালে তা ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ এলাকার মর্যাদা বাতিল করে। ১৯৫৮-৬২ তৈরি করা হয় কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। যার বাঁধের জন্য ডুবে যায় প্রায় ৫৪ হাজার একর আবাদযোগ্য ভূমি। উদ্বাস্তু হয় অন্তত এক লক্ষ আদিবাসী। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের ভেতর অসন্তোষ দানা বাঁধে কাপ্তাই বাঁধের সময়টাতে এবং বাঁধ পরবর্তীতে আরো স্পষ্ট হয়ে হয়ে ওঠে আর প্রায় একই সময়ে পাকিস্তান সরকার শুরু করে সেটেলম্যান্ট প্রজেক্ট। যা ক্রমে বাড়তে থাকে এবং এখনো চলমান।

নিরাপত্তার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাড়তে থাকে সেনাশাসন। সেটেলম্যান্টের নামে বাড়তে থাকে উচ্ছেদ। ভূমি দখল। ভূমি দখলের জন্য খুন হয় হাজার হাজার মানুষ, ধর্ষণের শিকার হয় অজস্র আর শত-সহস্র গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এবং তা অব্যাহত।

সাল	আদিবাসী/জুম্ম	%	বাঙালী	%	মোট
১৮৭২	৬১,৯৫৭	৯৮	১,০৯৭	২	৬৩,০৫৪
১৯০১	১,১৬,০০০	৯৩	৮,৭৬২	৭	১,২৪,৭৬২
১৯৫১	২,৬১,৫৩৮	৯১	২৬,১৫০	৯	২,৮৭,৬৮৮
১৯৮১	৪,৪১,৭৭৬	৫৯	৩,০৪,৮৭৩	৪১	৭,৪৬,৬৪৯
১৯৯১	৫,০১,১৪৪	৫১	৪,৭৩,৩০১	৪৯	৯,৭৪,৪৪৫
২০১১	৮,৪৫,৫৪১	৫৩	৭,৫২,৬৯০	৪৭	১৫,৯৮,২৩১
২০২২	৯,২০,২১৭	৪৯.৯	৯,২২,৫৯৮	৫০.১	১৮,৪২,৮১৫
বাংলাদেশ জেলা গ্যাজেট (১৯৭৫); আদমশুমারি (১৯৭৪,১৯৮১,১৯৯১,২০১১,২০২২) [৬][৭][৮]					

পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন (১৯১৫-১৯৭৩) [৩][৪][৫]

১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে চাকমা যুবক সমিতি গঠিত হয়।

১৯১৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে চাকমা যুবক সঙ্ঘ গঠিত হয়।

১৯২০ সালে কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি গঠিত হয়।

১৯৫৬ সালে হিল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়।

১৯৬৫ সালে পাহাড়ি ছাত্র সমিতি করা হয়।

১৯৬৬ সালে অনন্ত বিহারী খীসা ও জে বি লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় উপজাতীয় কল্যান সমিতি।

১৯৭০ সালে এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি। মূলত পাহাড়ি ছাত্র সমিতির ছাত্ররা, যারা তৎকালীন পিকিং পন্থী রাজনীতি বা মাও সে তুং চিন্তাধারা দ্বারা প্রাণিত ছিলো, তাদের যুক্ততায় এই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা হয়।

১৯৭২ সালে এম এন লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গড়ে তোলা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিরোধ সংগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হয়ে ওঠে (১৯৭২-১৯৯৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা পি সি জে এস এস। ১৯৭২ সালে এম এন লারমার নেতৃত্বে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। একই সাথে তৈরি হয় এর সামরিক শাখা শান্তি বাহিনী। শান্তি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জে বি খীসা। পিসিজেএসএস এর আরো গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বদের মধ্যে অনন্ত বিহারী খীসা বা এ বি খীসা ছিলেন অন্যতম। মূলত ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব সরকারের কাছে পাহাড়ের স্বায়ত্বশাসনের জন্য চার দফা দাবী পেশ করা হলে তা যখন প্রত্যাখাত হয় তখন এই সংগঠনের সূচনা হয়। ১৯৭৫-এর পর শান্তি বাহিনী সক্রিয় হতে শুরু করে। পাহাড়ে নিপীড়ন ক্রমেই যখন বেড়ে চলছে তখন পাহাড়ের জনগণ এর প্রতিরোধ সংগ্রামে জড়ো হয় এই সংগঠনে। তৎকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পাহাড়ের মানুষের নির্ভরযোগ্য ও বিপ্লবী ধারার সংগঠন হিসেবে যখন অগ্রসর হচ্ছে তখন একই সাথে এর মধ্যেকার প্রতিবিপ্লবী ধারাও ক্রমেই জোট বাঁধছিল যা প্রকাশ পায় ১৯৮৩ সালে। প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বে একটি গ্রুপ ভারতপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে। তারা চাইছিলো বাঙালী সেটেলারদের আক্রমণের মধ্যে দিয়ে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ভারতের সাথে যুক্ত হতে। এম এন লারমাসহ সংগঠনের প্রধান অংশ এর তীব্র বিরোধিতা করে। এম এন লারমা নিরস্ত্র বাঙালী সেটেলারদের আক্রমণের চিন্তাকে রাজনৈতিক ভুলপন্থা হিসেবে দেখেন। একই সাথে ভারতকেও সম্প্রসারণবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বাধীন গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একই বছর এম এন লারমাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জে বি লারমার নেতৃত্বে তাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম জারি রাখে। ১৯৯৭ সালে জে বি লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশ সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি করলে এই সংগঠনে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং একটি অংশ শান্তিচুক্তির বিরোধীতা করে। পাহাড়ে চলমান দীর্ঘদিনের স্বায়ত্বশাসনের লড়াই জারি রাখার জন্য সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ গঠন করে।

পাহাড়ের এই দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ইতিহাসকে পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কাপ্তাই বাঁধ পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃশ্যপটের বদলের সাথে সাথে সেখানে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। ১৯৭২ থেকে '৮৩ এবং '৯৭ এবং বর্তমান পর্যন্ত বিবেচনা করে এর ব্যর্থতা ও তার কার্য-কারণের অনুসন্ধান করা জরুরী। সংগঠনে ভারতপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী বা প্রতিবিপ্লবী অবস্থান ও বিপ্লবী অবস্থানের দ্বন্দ্বে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিরোধ সংগ্রামের মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সেইসাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের লড়াইয়ের বিকাশে প্রকৃত দ্বন্দ্বগুলো চিহ্নিত করে সমগ্র বাংলাদেশের নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের মুক্তির লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করার দায় পাহাড়-সমতলের বিপ্লবী জনগণের। ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলে, যেভাবে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির ছাত্র-যুবারা পাহাড়ের প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা করে তেমনি বর্তমান সময়ে পাহাড়ের ছাত্র-যুবাদেরই বিপ্লবী বার্তা পৌঁছে দিতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামে।

যে কাপ্তাই বাঁধের ফলে তৈরি হয়েছে পাহাড়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট। যার ধারাবাহিকতায় পাহাড়ের জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত, সেই কাপ্তাই জলবিদ্যুতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আজকের বাংলাদেশে প্রায় নেই। তবে আজও কেনো পাহাড়ের এই বিপুল বিস্তৃত ভূমি পানির অতলে। পাহাড়ে চলমান শোষণ বঞ্চনার বিপরীতে পাহাড়ের জনগণকে তুলে ধরতে হবে পাহাড়ের প্রকৃত প্রতিরোধ সংগ্রামের সৌন্দর্য।

তথ্যসূত্রঃ

[১] Militarization in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh – The Slow Demise of the Region's Indigenous Peoples edited by international work group for indigenous affairs(IWGIA), 2012.

[2] 'LIFE IS NOT OURS'- LAND AND HUMAN RIGHTS IN THE CHITTAGONG HILL TRACTS BANGLADESH by THE REPORT OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS COMMISSION, MAY 1991.

[৩] Insurgency and counterinsurgency: The Bangladesh experience in regional perspective – The Chittagong Hill Tracts By Brigadier Syed Muhammad Ibrahim, 1990.

[৪] পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা – প্রদীপ্ত খীসা

[৫] পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিবাহিনী জিয়া হত্যা মনজুর খুন – মহিউদ্দিন আহমেদ

[৬]Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh by Rajkumari Chandra Kalindi Roy/ IWGIA Document No. 99, Copenhagen, 2000.

[৭]The Consequences of Chittagong Hill Tracts (CHT) Peace Accord at the Village Level: Case Study of Khagrachari Hill District in Bangladesh by Ranjan Saha Partha/ Journal of International Development and Cooperation, Vol.22, No.1 & No.2, 2016.

[৮] জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

সমতার সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্বিচারী চরিত্র

নাদিরা ইয়াসমিন

"নারীর সম-অধিকার, সম-সুযোগ/ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশে যখন ২০২৪ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস মহাসমারোহের সাথে উদযাপিত হচ্ছিল, তা দেখে বারবার কেবল "গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেয়া" প্রবাদ প্রবচনটির কথা মনে পড়ছিল! মেয়েদের মায়ের জাত-দেবী-দশভুজা-হোম মিনিস্টার-কল্যাণী-সাবিত্রী-সর্বংসহা ইত্যাদি ইত্যাদি অভিধায় অভিষিক্ত হতে দেখলে যেমন মনে পড়ে! নারীর প্রতি রাষ্ট্র– সরকার– পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব জীবনে আইনী প্রাপ্য মেটানোর অনীহা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এইসবের পিছনের আসল উদ্দেশ্য কী! প্রকৃতপক্ষে এসবই হলো, গাছকে মাটি থেকে মূলসহ উপড়ে ফেলে ফাঁকি দেওয়ার জন্য গাছের ডালে ও পাতায় জল দেয়া অর্থাৎ পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়ার মতোই অনেকটা। যেন আমাদের থেকে বাস্তবতা ও প্রকৃত সত্য আড়াল করা যায়! সেজন্য ক্ষেত্রবিশেষে নারীর অসহায়ত্ব, ভীরুতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, পরনির্ভরতা, ঈর্ষাকাতরতা ও কর্তাসত্ত্বার অনুপস্থিতি দেখে এই দেবীদেরই আবার সমাজ ভিক্টিম ব্লেইমিং করতে ও 'মেয়েমানুষ' বলে অভিহিত করতে একমুহূর্ত দেরি করে না! আমরা মেয়েরাও অধিকাংশই এসব অভিধা শুনে আনন্দে বাক-বাকুম করে উঠি প্রায়শই এবং নিজেদের এসবই ভাবতে থাকি! ভাবতে থাকি আমরা তো 'মেয়েমানুষ'। অথচ এসবের পিছনের রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কম জনই ধরতে পারি, বুঝতে পারি।

২

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার কথা বারবার ঘোষিত হয়েছে। স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সমান মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের। শুধু তা-ই না, হাজার হাজার বছরের বঞ্চনার শিকার নারীদের সমাজের মূলধারায় যুক্ত করতে, ফিরিয়ে আনতে ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ সুযোগের অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানে নারীর অধিকার, সমতা ও সুযোগ সম্পর্কিত কয়েকটি ধারার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়;

২৭ অনুচ্ছেদ, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"

অনুচ্ছেদ ২৮ (১), কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।"

অনুচ্ছেদ ২৮ (২), "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"

অনুচ্ছেদ ২৮ (৪), "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

অনুচ্ছেদ ২৯ (১), "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

অনুচ্ছেদ ২৯ (২) "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবে না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হইবে না।"

অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩) এ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। সেজন্য নারীর জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।"

অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুযায়ী স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার ২৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

৩

নারীর সমানাধিকারের, বিশেষাধিকারের সাংবিধানিক আইনী স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তব জীবনে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই, এসবের বেশির ভাগই কাগুজে সান্ত্বনা মাত্র! মাইটোকন্ড্রিয়া যদি জীব কোষের শক্তির প্রাণকেন্দ্র বা আধার হয়ে থাকে, পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকারের স্বীকৃতি, অধিকারের প্রতিষ্ঠা লাভ বাদবাকি অধিকার আদায় করে নেওয়ার শক্তির প্রধান উৎস, প্রধান শর্ত। ব্যক্তির অধিকারের এই মূল জায়গাটাতেই ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নারীদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে রাখা হয়েছে। অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদের পুত্র সন্তানের অর্ধেক অংশীদার করার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করার বাস্তব, সামাজিক, পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

পিতার সম্পত্তিতে যখনই কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের সম-অংশীদার করার অধিকার প্রসঙ্গে দাবি উত্থাপন করা হয়, তখনই ধর্মগুরু থেকে শুরু করে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সব শ্রেণি পেশার লোকই ধর্ম গেল, সমাজ গেল বলে শোরগোল তুলে।

এক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ কোন সম্প্রদায়ই কেউ কারো চেয়ে কম যান না! তারা এমন সব যুক্তি দেখান, যেনবা ধর্ম-সমাজ-পরিবার-জগৎ-সংসারের যাবতীয় কিছুর টিকে থাকাই নির্ভর করছে কন্যা সন্তানকে পিতার সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উপর।

হিন্দুপ্রথা ও বাংলাদেশের আইন অনুসারে পিতা-মাতা মারা গেলে পিতার সম্পত্তি শুধু ভাইয়েরাই পায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের উপস্থিতিতে সম্পত্তির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। পুত্র সন্তান না থাকলে অবিবাহিতা কন্যা এবং পুত্রবতী কন্যারা জীবনস্বত্বে সম্পত্তির অধিকার পায়। অন্যদিকে বন্ধ্যা, বিবাহিতা কন্যা, বিধবা কন্যা এবং কন্যা সন্তান জন্মদানকারী কন্যারা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ কন্যা সন্তানের অধিকার নির্ভর করে তার পুত্র থাকা বা না থাকার উপর। বৌদ্ধ ধর্মের উৎস হিন্দু ধর্ম হওয়ায় এবং বৌদ্ধ ধর্মে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কোন আলাপ না থাকায়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করা হয়।

৪

বিভিন্ন সংস্থার গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা তৈরি আইন কমিশন প্রদত্ত “হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের সুপারিশ বিষয়ক আইন কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন” বা “খসড়া হিন্দু উত্তরাধিকার আইন– ২০২০” থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিগুলো হলো;

*** নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে মেয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাদের সম্পত্তির অংশ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না এবং সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা প্রভাবশালী বিত্তবান লোকের হাতে চলে যাবে!
*** সম্পত্তির লোভে অন্য ধর্মের লোক হিন্দু নারীদের প্রলোভিত করে তাদেরকে সম্প্রদায় ত্যাগ করতে বাধ্য করবে, যার ফলে হিন্দু সমাজ ও সম্পত্তি ধ্বংসের মুখোমুখি হবে!

মুসলিম কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের অর্ধেক অংশীদার করার পিছনে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যেসব যুক্তি দেখিয়ে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, নারীদের অন্য অনেক দিক থেকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে। “তারা তো স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায়!” “তাদের তো দেনমোহর দেয়া হয়”। কাজেই তাদের পিতার নিকট থেকে এতো সম্পত্তির দরকার নেই! প্রকারান্তরে তারা যেন বলতে চান, মেয়েদের এত্তো এত্তো দিক থেকে সম্পত্তির অংশীদার করা হয়েছে, তারপরও পিতার সম্পত্তির কী দরকার! ভাবটা এমনই, যেন অন্যান্য দিক থেকে সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার অধিকার শুধু মেয়েদেরই করা হয়েছে, ছেলেদের করা হয়নি! স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান থাকলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ২ আনা, সন্তান না থাকলে ৪ আনা অংশীদার হোন। অপরদিকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তান থাকলে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ৪ আনা, সন্তান না থাকলে ৮ আনা সম্পত্তির অংশীদার হোন। অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী যে কারো মৃত্যু হলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির যতোটুকু ভাগের অধিকারী হোন, স্বামী হোন স্ত্রীর তুলনায় দ্বিগুণ সম্পত্তির অধিকারী। অথচ প্রায়ই যুক্তি হিসেবে নিয়ে আসা হয়, মেয়েরা তো স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায়!

আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ছাড়া অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে দেনমোহর খুব সামান্যই নির্ধারিত হয়। আর সব ক্ষেত্রেই যা-ও নির্ধারণ করা হয়, সেটাও কদাচিৎ পরিশোধ করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত অধিকারগুলোর মতো শূন্য বা বকেয়াই থেকে যায় আজীবন! তাছাড়া দেনমোহরের মাধ্যমে অর্থ কিংবা সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারকে কখনোই সম্মানজনক বলে মনে করা যায় না। এক্ষেত্রে দেনমোহর দিয়ে স্বামীরা সাধারণত মনে করে, স্ত্রীকে অর্থের মাধ্যমে কিনে এনেছে! এজন্য অনেক শিক্ষিত, আধুনিক মেয়েই দেনমোহর ছাড়া অর্থাৎ নামমাত্র প্রতীকী দেনমোহরে বিয়ে করেন আজকাল।

বাস্তব জীবনে আমরা কী দেখি? আমরা দেখতে পাই, পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে দৈবাৎ। কেননা পৈতৃক সম্পত্তি আগের প্রজন্ম থেকে কোন রকম মাধ্যম ছাড়া সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রাপ্তির সুযোগ ১০০ ভাগ নিশ্চিত। অপরদিকে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারের উৎস নিজেরই প্রজন্ম কিংবা পরের প্রজন্ম, যা প্রাপ্তির সুযোগ প্রায় ১০০ ভাগই অনিশ্চিত! সেটা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন: ভাই-বোন-পুত্র-কন্যার নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির দাবিদার তখনই হওয়া যায়, ক্ষেত্রবিশেষে শেষ জীবনে তারা গত হলে এবং নিঃসন্তান হলে। তাছাড়া সম্পত্তি সন্তানদের, বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের দখলে থাকে বিধায় সেখান থেকে কোন অংশীদারের প্রাপ্য সম্পদ বের করে নিয়ে আসা আর এভারেস্ট জয় করা একই বিষয়। এভারেস্ট চূড়া জয় করে অক্ষত দেহে ফিরে আসা যেমন অতিশয় দক্ষতা ও ভাগ্যের ব্যাপার, তেমনি ভাই কিংবা তাদের সন্তানদের নিকট থেকে নিজের সম্পত্তির অংশ বের করে নিয়ে এসে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পারিবারিক, সামাজিক, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে পারা অমাবস্যার চাঁদ দেখতে পাওয়ার মতোই অসম্ভব ঘটনা! এই প্রায়

১০০ ভাগ অনিশ্চিত ক্ষেত্র থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির মূলো দেখিয়ে, মেয়েদের ১০০ ভাগ নিশ্চিত ক্ষেত্র থেকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েরা যখনই পিতার সম্পত্তির অধিকার চাইতে যায় তখন এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চোখে তারা হয়ে যায় অবলা, সরলা, নির্বোধ, ছেলে ভুলানো প্রলোভনে আকৃষ্টা। আর নির্ধারিত পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ নিজের সম্পত্তির ভাগ আনতে গেলে মুসলিম মেয়েদের লোভী, ছোট লোক, আত্মসম্মানবোধহীন ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়! বলা হয়, ভাইয়ের কাছ থেকে সম্পত্তির ভাগ আনতে চাচ্ছে! ভাইয়ের সম্পত্তি আবার কী! ভাই কি নিজের সম্পত্তির ভাগ দেয় নাকি! নিলে ভাইয়ের কাছে রেখে যাওয়া বোন তার নিজের সম্পত্তি নিবে! উল্টো ভাই যে বোনের সম্পত্তি ভোগ দখল করে খাচ্ছে, সেটা যেন কিছু না! আমরা যখনই নিজেদের অধিকার-স্বাধীনতা-কর্তাসত্ত্বা নিয়ে ভয়েস রেইজ করি, হিস্যা দাবি করি, এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে তখন আমরা অবলা, সরলা, নির্বোধ, ছেলেভোলানো গল্পে আকৃষ্টা, লোভী, ছোটলোক, রাতের রাণী, ভ্রষ্টা, নষ্টা, ডাইনী, নারীবাদী, ধর্মবিরোধী, নাস্তিক ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে যাই। আর পুরুষ তখন তাদের কাছে উল্টো হয়ে যায়, দায়িত্বশীলতার পরাকাষ্ঠা-মহান-অতি সরল-নির্বোধ-ছেলে ভুলানো গল্পে আকৃষ্ট অতি ভালো-পূত-পবিত্র।

মুসলিম পারিবারিক আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অংশীদারিত্ব পুত্র সন্তানের অর্ধেক হওয়ার কথা থাকলেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পুরোটাই কাগুজে বাঘের মতোই। পিতার সম্পত্তির ভাগ চাইতে গেলেই পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিরা চারদিক থেকে বলা শুরু করে এবং দৃষ্টান্ত খুঁজে নিয়ে আসে সম্পত্তির ভাগ নিলে নাকি ভাইদের অভিশাপ সারা জীবন বহন করতে হবে বোনদের। আর ভাইয়েরাও মনে করে, বোনেরা সম্পত্তির ভাগ নিয়ে গেলে ভাই-বোনের সম্পর্ক চর্চার প্রয়োজনীয়তাও চুকিয়ে যায় এবং চুকিয়ে ফেলার হুমকিও দেয়া হয়। শুধু তা-ই না, চুকিয়ে ফেলাও হয়, যারা সবকিছু অগ্রাহ্য করে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ চাইতে আসে। একদিকে 'ভাইদের অভিশাপের মিথ', সমাজ ও আত্মীয়-পরিজনদের কাছে 'লোভী' ও 'ছোটলোক' বনে যাওয়া, বাপের বাড়ির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি মেয়েদের মধ্যে যে আতংক আর ডিল্যেমার জন্ম দেয়, সারাজীবন তারা সেটা থেকে বের হতে পারে না সাধারণত। আর মেয়েদের বের হওয়ার মতো করে কর্তাসত্ত্বার বিকাশের সুযোগ, সময়, পরিবেশ, শিক্ষাও দেওয়া হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগির পর যদি ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক শেষ হয়ে না যায়, তাহলে ভাইয়ের সাথে বোনের সম্পর্ক সমাপ্তির এই আতংক মেয়েদের মনে সচেতনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার এবং সম্পর্কচ্ছেদের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্য ও স্বার্থ রয়েছে। সেটা হলো, সচেতনভাবে বোনদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জমিন তৈরি রাখা। এর ফলে মুসলিম নারী কদাচিৎ বাবার সম্পত্তির ভাগ চাইতে যায়, চাওয়ার সাহস দেখা যায়।

৫

একটা সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশে বেড়া ওঠা মেয়েও যখন শৈশবেই চারপাশের নানা ঘটনা ও পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে জেনে যায় এবং বুঝতে পারে, সে তার ভাইয়ের সমান না। সেটা সম্পত্তির অধিকারের দিক দিয়েও না, আবার জীবন যাপনের দিক দিয়েও না। এই বাস্তবতা মেয়েদের মনস্তত্ত্ব গঠনে বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে শৈশব থেকেই মেয়েরা একপ্রকার অস্তিত্বহীনতার সংকটে ভোগে। এই অস্তিত্বহীনতার সংকট যেটুকু প্রাপ্য অধিকার, সেটুকুও চেয়ে নেওয়ার সাহস নিঃশেষ করে দেয়। বড় কিছুর স্বপ্ন দেখার জন্যও পায়ের তলায় মাটি থাকা লাগে। তাই তাদের জীবনে বড় কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কমই থাকে। কোন রকম টিকে থাকাই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে তাদের চিন্তাও থাকে মূলত বিয়েকেন্দ্রিক, স্বামীকেন্দ্রিক। এমনকি একটা মেয়ে লেখাপড়া শেষ করে ভালো কোন পেশায় গিয়েও সৎভাবে উপার্জন করে জায়গা কিনে, ছোট্ট একটা বাড়ি করতে জীবনের ৪/৫ সময় চলে যায়। অপরদিকে তারই কোন ভাইকে দেখা যাবে, কষ্ট করে পড়াশোনা করে চাকরি কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াই জন্মের পর পরই এরচেয়ে কয়েক গুণ বেশি সম্পদের অধিকারী হয়ে গিয়েছে শুধু ছেলে বলে। দেশের ৯৬% জমির মালিক পুরুষ, এই নির্মম সত্যটাই আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এই একুশ শতকেও এই বৈষম্য চূড়ান্ত মাত্রায় অন্যায়, গর্হিত অপরাধ।

সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে কেবল নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই জড়িত না, নারীকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টা জড়িয়ে রয়েছে। অর্ধেক কিংবা পুরোপুরি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে নারীকে ঊনমানুষ ও নয় মানুষ বানিয়ে রাখা হয়েছে। যারা নয় মানুষ, পূর্ণাঙ্গ/ সম্পূর্ণ মানুষ না, তাদের শুধু অর্ধেক না, সবটা থেকেই বঞ্চিত করা যায়। তাদের সাথে যা খুশি তা-ই করা যায়। এই ন্যায্যতা তৈরি হয়ে যায়। এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে এই ন্যায্যতা তৈরি হয়ে এসেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় তারই কয়েক শত সুস্থ, সবল, জীবিত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে দুই দু'শো বছর আগেও। শুধুমাত্র সন্তান কিংবা পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারায় আজও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়, কিংবা আবারো বিয়ে করে ঘরে নতুন স্ত্রী নিয়ে আসা হয়।

বাংলাদেশের মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাদের এই আশ্রয়হীনতা, সম্পত্তিহীনতার সুযোগ ভালোভাবেই নেয়। তারা জানে যতোই অপমান-অসম্মান-শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা হউক না কেন, কর্মহীন ও উপার্জনহীন গৃহবধূটির এইসব নির্যাতন সহ্য করে শ্বশুর বাড়িতে থেকে যাওয়া ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় অপশন খোলা নেই। বাবা ভাইও পাত্রস্থ করার মধ্য দিয়ে যে দায়িত্ব শেষ করে দিয়েছিলেন, পুনরায় সে দায়িত্ব কাঁধে নিতে চান না। বাড়তি বোঝা বলে মনে করেন। বাপের বাড়িতে ফিরে গেলেও সেখানে তাদের জন্য অধিকারহীন আরেক পরজীবীর জীবন অপেক্ষা করে থাকে।

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের বাত, আথ্রাইটিস, স্পোর্টস ইনজুরি ও পক্ষাঘাত রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডা: মনিরুল ইসলাম মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আলাপকালে কথা প্রসঙ্গে জানান, নারীর নিজেদের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকায়, অনেক সামর্থ্যবান স্বামীও স্ত্রীর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার খরচ বহন করতে চান না। নানান অজুহাতে মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ করে দেন।

অথচ মেয়েরা যদি ভাইদের মতো পিতার সম্পত্তির ভাগ পেতো, তাহলে শ্বশুর বাড়িতে তাদের কদর থাকতো। আর কোন কারণে নির্যাতনের শিকার হলে, সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলেও নতুনভাবে জীবন শুরু করার এবং জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার রসদের অভাবে পড়তে হতো না। অসহায়ের মতো শ্বশুর বাড়ির নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করা, আত্মহত্যাকে বেছে নেওয়া কিংবা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে দুইদিন পরপর পত্রিকার শিরোনাম হতে হতো না আমাদের বোনদের! একদিকে পড়াশোনার মাধ্যমে বোধ বুদ্ধি তৈরি ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির সময় সুযোগ না দিয়ে বিয়ে দিয়ে এবং অপরদিকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে নারীদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাতারে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

অনেকে বলতে পারেন এবং বলেনও, 'আইন দিয়ে কী হবে?' বর্তমান জমানায় আইনগত ভিত্তি অবশ্যই অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি এবং প্রথম শর্ত। আইনগত ভিত্তি না থাকলে অধিকার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, দাবিই তো তোলা যায় না। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের সম-অংশীদারিত্ব না থাকায়, যেসব পরিবারে কেবল কন্যা সন্তান থাকে অর্থাৎ কোন পুত্র সন্তান থাকে না, সেরকম প্রায় প্রতিটি পরিবারে এক অনন্ত যুদ্ধ চালু হয়ে যায় চাচাতো ভাইদের সাথে সম্পত্তি নিয়ে এই আইনগত কারণেই। এক্ষেত্রে চাচা অর্থাৎ চাচাতো ভাইদের আইনগতভাবে সম্পত্তির অংশীদার করায় তারা চায় চাচাতো বোনের সম্পত্তি দখল করে নিতে। অপরদিকে কন্যা সন্তানের পিতা-মাতারা চান, সমস্ত সম্পত্তি নিজের কন্যা সন্তানকে দিয়ে যেতে। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের সম-অংশীদারিত্ব এই পারিবারিক জটিলতার নিরসন করতে পারে। এই আইনগত ভিত্তির কারণেই অসহায়, বন্ধ্যা, নির্যাতিতা, বিধবা হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নারীদের বিয়ের পর ভাইয়ের বাড়িতে স্থান পাবে কিনা সেটা একান্তই ভাই-ভাবির দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করে। আর স্থান পেলেও সেটাকে কোন সম্মানজনক স্থান পাওয়া বলে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। অনেকটা বাড়ির চাকরানীর মতো স্থান পাওয়া।

পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অংশীদারিত্ব শৈশবেই কন্যা শিশুর ভাবজগতকে আমূল বদলে দিবে। তাদের স্বপ্ন, লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, জীবনবোধকেও প্রভাবিত করবে। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিবে। পরজীবী না হয়ে সংগ্রামী জীবন বেছে নিতে উজ্জীবিত করবে। 'এতো কিছু করে অর্ধেক সম্পত্তি এনে আর কী হবে', 'এই অর্ধেকও তো দেয়া হবে না, সামান্য কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নেয়া হবে', এখন এমন মনোভাব কাজ করে সাধারণত। সমান সমান হলে কিন্তু এমনটা কাজ করবে না। আগের মতো সম্পত্তি না দেওয়ার জন্য সকল ফন্দি ফিকির ব্যর্থ হয়ে যাবে। জন্মের পর কোন মানুষ যখন ভাবতে শিখে সে কারো থেকেই ছোট না, তখন তাকে দমিয়ে রাখা পৃথিবীর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সম্পত্তির সম-অংশীদারিত্ব কন্যাদের মনে এই বোধটাই জাগিয়ে তুলতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। শুধু সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা না, অন্য সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই বোধ কাজ করবে। এটা নারীদের জীবনবোধ থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপ্তি, উজ্জ্বলতা আমূল বদলে দিবে। তাদের এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে ভূমিকা পালন করবে।

একটা দেশের প্রায় অর্ধেক নাগরিককে কখনো আইনগতভাবে, কখনো প্রায়োগিকভাবে জীবন-স্বাধীনতা-সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং কর্তাসত্ত্বা গড়ে ওঠার পথে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা রেখে তাদের প্রকৃত বিকাশ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি দেশটাকে একটা ন্যূনতম পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবেও গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই কথা কি প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ প্রধান নির্বাহী ক্ষমতায় থাকা নারী প্রধানমন্ত্রীরা তথা দেশের প্রধান নীতি নির্ধারকরা জানেন না? অবশ্যই জানেন। না জানার কথা নয়। এরপরও তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে অতি সংক্ষিপ্ত এবং প্রধান রাস্তা বাদ দিয়ে বছরের পর বছর দূরের অলিতে গলিতে ঘুরপাক খাচ্ছেন এবং আমাদেরও খাওয়াচ্ছেন। এবং গাছের গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল দিয়ে চলেছেন!

দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) সেই ১৭ শতকেই অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় চারশত বছর আগে জানান দিয়ে গিয়েছেন– মানুষের ৩টি প্রাকৃতিক তথা জন্মগত অধিকারের কথা: জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি (Life, Liberty and Property) এবং নাগরিকদের এইসব জন্মগতভাবে পাওয়া অধিকারের সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্র যে নৈতিকভাবে বাধ্য সে কথা। নিজেদের সভ্য বলে দাবি করা পুঁজিবাদী দেশগুলোও বহু আগেই তাদের নাগরিকদের জন্মগতভাবে পাওয়া এসব অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাস্তব জীবনে কার্যকর করেছে।

এই লক্ষ্যেই জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার আইন ঘোষণা করেছে। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women বা সংক্ষেপে সিডও (CEDAW) সনদ গৃহীত হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অফ রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয় পুঁজিবাদী দুনিয়ায়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে সিডও সনদে স্বাক্ষর করে। কিন্তু সিডও সনদে বাংলাদেশ অনুমোদন করলেও তা পরিপূর্ণভাবে করেনি। বাংলাদেশ সরকার শুরুতে সিডও সনদের ধারা-২, ১৩(ক), ১৬.১(গ) ও (চ) ধারাগুলোয় আপত্তি জানিয়ে তা অনুমোদন করেনি। পরবর্তী সময়ে সরকার ১৩(ক), ১৬.১(চ) অনুচ্ছেদ থেকে আপত্তি তুলে নেয়। বাকি ২টি ধারা থেকে আপত্তি তুলে নেয়নি এবং অনুমোদন করেনি আজও । বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি দেয়া ২টি ধারার মধ্যে, ধারা-২তে, বৈষম্য বিলোপ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের জন্য নীতিমালা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। প্রতিটি দেশের জাতীয় সংবিধান, আইন-কানুন ও নীতিমালায় নারী ও পুরুষের সমতার নীতিমালা সংযুক্তকরণ ও তার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা। সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা। এজন্য আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীকে সব ধরনের বৈষম্য থেকে রক্ষা করা এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন রোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে।

ধারা-১৬.১(গ): বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের একই অধিকার ও দায়দায়িত্ব নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকার বর্তমানে প্রচলিত আইনগুলোর পর্যালোচনা করবে এবং একটি সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করবে, যা সব ধর্ম ও বিশ্বাসের লোকদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হবে। এতে বিয়ে এবং তালাকের সময় সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করবে। সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালা-১১, জাতীয় বাজেট ইত্যাদিতে নারীদের জন্য হ্যান করেঙ্গে, ত্যান করেঙ্গে বলে কথামালার পর কথামালা গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু সিডও সনদের ধারা-২ ও ধারা ১৬.১(গ) এই দুটি ধারার মধ্যে যে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রাণভোমরা লুকিয়ে রয়েছে, সেখানে এসে কবির মতো তারাও নিরব! এই দুটি ধারা অনুমোদন ও কার্যকর করা না হলে আগামী ৫শত বছরেও পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতার যে মানদণ্ড রয়েছে, তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। শুধু তা-ই না, এ ২টি ধারা কার্যকর না করে নারীকে পুরুষের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া আর হাত-পা বেঁধে উত্তাল নদী পারি দেওয়ার জন্য বলা একই কথা। এটা শুধু নারীর সাথে মস্করা না, চূড়ান্ত মাত্রায় প্রতারণাও।

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক এই স্বাধীন, সার্বভৌম, গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটানো হয়েছিল সকল প্রকার অসমতা, অন্যায্যতা, বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে' (স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও সমতার অঙ্গীকার করা হয়েছে (২৭ অনুচ্ছেদ)। এবং রাষ্ট্রের কোন আইন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে, যেটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেটুকু বাতিল বলে গণ্য করার অঙ্গীকার করা হয়েছে (২৬ এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)।
(৭) রুশোর মতে, আমাদের প্রত্যেকটি স্বাধীন কার্যই ২টি শক্তির সম্মিলনে সম্পাদিত হয়।
১/ নৈতিক/ নীতিগত/ ইচ্ছা/ ইচ্ছাশক্তি,
২/ দৈহিকশক্তি,

দৈহিকশক্তি নীতিগত বা ইচ্ছাশক্তিকে কার্যে পরিণত করে। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যখন কেউ হাঁটতে শুরু করে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়, সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন স্থানে বা লক্ষ্যবস্তুর কাছে পৌঁছাতে চায়। বস্তু/ স্থানটির কাছে যাওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো, কাঙ্খিত লক্ষ্যে বা স্থানে পৌঁছে দেওয়ার মতো শক্তি দুটি পায়ের আছে কিনা? একজন পঙ্গু ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছে হতে পারে দৌড়ে যাওয়ার। আবার একজন সুস্থ মানুষের দৌড়াবার ইচ্ছে নাও থাকতে পারে। বাস্তবে দুজনার ক্ষেত্রেই ফল একটিই। তারা উভয়েই একই স্থানে অবস্থান করবে। তাদের কারুরই অবস্থানগত কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

রাষ্ট্রসংস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ও তাদের মানসকে কীভাবে গড়ে তুলতে চায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন দেখতে চায়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত নিতে হয় নাগরিক তার সহনাগরিকের সাথে কেমন আচরণ প্রদর্শন করবে এবং সেইভাবে তাদের গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে হয়। নারীর অবস্থা, অবস্থান, পড়াশোনা, অধিকার, পোশাকের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নারী-পুরুষ সম্পর্কে নারীর অবস্থান কেমন হবে সে সম্পর্কেও আগে প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেজন্য নীতি নির্ধারণ করে কর্মসূচি ও প্রকল্প হাতে নিতে হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রের রিপ্রেসিভ (পুলিশ, আদালত, সেনাবাহিনী, জেলখানা, সংসদ ইত্যাদি) ও আইডিওলজিক্যাল (আইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, সিনেমা, নাটক, সংস্কৃতি, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) স্টেট অ্যাপারেটাসগুলোকে সেসব নীতি, কর্মসূচি, প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ নারীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রথম বিনিয়োগটা রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

১৯৬১ সালে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন থেকে না-শরীকের ধারা বাতিল করায় কতো শত এতিম সন্তানের দীর্ঘশ্বাস যে রোধ করা গিয়েছে, আমাদের আশেপাশে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাবো। যদিও পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আমাদের যে দাবি সেটা কোন ধর্মের কাছে নয়, রাষ্ট্রের কাছে। এরপরও সমতার প্রসঙ্গ আসলেই একটা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বারবার ধর্ম বিরোধিতার প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শত শত বছর ধরে আমাদের যে ধর্ম নির্ধারিত প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে ও হচ্ছে, এতে কোন রকম ধর্মবিরোধিতা দেখতে পান না তারা। যদিও ধর্মগ্রন্থের কোথাও নারীদের সমান ভাগ দিতে নিষেধ করা হয়নি এবং পাপ বা ধর্মবিরোধী বলে অভিহিত করা হয়নি। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই সেটা অনুধাবন করতে পারার কথা। এবং আমাদের বিশ্বাস একদিন তারা সেটা অনুধাবন করতে পারবেনও। এছাড়া সম-অংশীদারীত্বের আইন করা হলেও কেউ ধর্মকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে কম নিতে চাইলে বা না নিতে চাইলে সে সুযোগ তো থাকবেই। এজন্য সমতার প্রশ্নে সমস্যা মূলত নারীকে অধস্তন করে রাখতে চাওয়া পিতৃতন্ত্রকে যারা টিকিয়ে রাখতে চান তাদের, ধর্ম ও ধার্মিকদের নয়।

তাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে তার দ্বিমুখী ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে নারীর পক্ষে তথা নারীকে এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিবে কিনা এবং সে অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করে কর্মসূচি গ্রহণ করবে কিনা? না নারীবিরোধী, পিতৃতান্ত্রিকদের পক্ষেই তার অবস্থান জারি রাখবে? যদি নারীবিরোধীদের পক্ষেই রাষ্ট্র তার অবস্থান জারি রাখে, তাহলে দেশের নারী সমাজকেও ভেবে দেখতে হবে, এই দ্বিচারী ও পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে তাদের সম্মতি অবিরত দিয়ে যাবে কিনা?

তথ্যসূত্র:

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
২। সিডও সনদ
৩। নারী উন্নয়ন নীতিমালা– ১১
৪। রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, অনুবাদ সরদার ফজলুল করিম, তৃতীয় পুস্তক।
৫। রাষ্ট্র ও ভাবাদর্শ,
লুই আলথুসের ভূমিকা, ভাবানুবাদ ও পর্যালোচনা– আলতাফ পারভেজ
৬। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৭ এপ্রিল, ২০২৩
৭। Two Treatises of Government- John locke

বহুকেন্দ্রীক বিশ্বব্যবস্থা-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপক্ষ নয়

রেভ্যুলুশনারী কমিউনিস্ট– নরওয়ে
অনুবাদ: মোয়াজ বিন সাইফুল

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে পরে, যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীর উপর আধিপত্যকারী একমাত্র পরাশক্তি হয়ে উঠলো। সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র'র অনেক মুখপাত্র এ ঘোষণা দিয়েছিলো যে ইতিহাস তার শেষ অধ্যায়তে এসে পৌঁছেছে এবং নতুন শতাব্দী লিবারেল ও গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য হবে স্বর্ণযুগ।

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা'র বইয়ের কালি শুকিয়ে আসবার আগেয় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য ধরে রাখা আমেরিকার জন্য বেশ কঠিন যাচ্ছে। এখন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে বিশ্ব এককেন্দ্রীক শোষণ ব্যবস্থা থেকে বহুকেন্দ্রীক শোষণ ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশেষত চীন ও রাশিয়ার সাথে প্রতিযোগি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র তার একচ্ছত্র আধিপত্য হারাচ্ছে।

এখানে বামপন্থীদের মধ্যে নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। অন্যদিকে অনেকে বিভিন্ন মাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীন এবং রাশিয়ার নতুন স্নায়ুযুদ্ধে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে। আবার অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদীয়মান চীন ও রাশিয়ান শক্তির সাথে এসে দাঁড়িয়েছে। বহুকেন্দ্রীকতা এমন রাজনৈতিক একটা প্রবণতা যেখানে একটি বহুকেন্দ্রীক বিশ্ব তৈরির আশায় প্রতিযোগি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলোর উন্নয়নে উৎসাহী করা হয়, যেখানে পরাশক্তিগুলো পরস্পর একে অন্যকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারে। বহুকেন্দ্রবাদীরা প্রায়শই নিজেদের কে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে, কিন্তু বাস্তবে তারা এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার শক্তিকেই আরো সুন্দর করে তোলে, তারা অস্বীকার করে যে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা অনিবার্যভাবে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায় এবং একজনের সাথে পাশে থাকে অন্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ব্লক।

চীন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়

সাম্রাজ্যবাদীদের কেউ কেউ নিজেদেরকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হিসেবে দেখে আবার লেনিনের সাথে একমত হতে চান। তারা প্রায়ই দাবী করে যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা মোটেও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা না বরং এটি সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা। তারা চীনকে দেখে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা জবাব হিসেবে এবং তারা আশা রাখে বিশ্ব ব্যবস্থায় চীনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার উপর। চীন আজ একটি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি যা অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে এবং প্রতিযোগিতা করে বাজার, বাণিজ্য পথ এবং কাঁচামালের জন্য। চাইনিজ সাম্রাজ্যবাদ ঋণ এবং সরাসরি বিনিয়োগ উভয়ের মাধ্যমে বিশেষ করে আফ্রিকায় বিনিয়োগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। চীন বহু যুগ ধরে সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। ১৯৭৬-৭৮ এর প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের কাছে চীনে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব পরাজিত হয়েছিল এবং চীনে শাসন ব্যবস্থায় আর প্রলেতারিয়েতরা নেই বরং তৈরি হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একটি নতুন শ্রেণী। পুঁজি সঞ্চয় চীনা অর্থনীতির প্রধান নীতি, জনগণের প্রয়োজন নয়।

বহুকেন্দ্রবাদীরা দাবী করে চীন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে সদয় কারন হাজার হলেও চীন কোনো দেশের সাথে যুদ্ধে জড়ায়নি। প্রথমত, এটি কোনো প্রমাণ নয় যে চীন সমাজতান্ত্রিক বা অ-সাম্রাজ্যবাদী। দ্বিতীয়ত, চীন বিভিন্ন দেশের গৃহযুদ্ধে পরোক্ষভাবে জড়িত হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ চালায় তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে তাদের জনগণের বিরুদ্ধে, যেমন ফিলিপাইন, ইথিওপিয়া এবং শ্রীলঙ্কা। চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও বৈশিষ্ট্য সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। চীন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী" নয় বরং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী যারা আন্তর্জাতিক লাভের জন্য তার সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসকে কাজে লাগাচ্ছে।

রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ এবং ইউক্রেন যুদ্ধ

বহুকেন্দ্রবাদীরা অস্বীকার করে যে রাশিয়া একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ, দাবি করে যে রাশিয়া অবশ্যই প্রগতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কারণ রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তারা আরও জোর দেয় যে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সেনাবাহিনীতে অনেক কম খরচ করে, এবং একই সাথে আর্থিক এবং শিল্প মূলধনের দিক থেকে। রুশ সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে মার্কিন (এবং চীনা) সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু দুর্বল সাম্রাজ্যবাদও সাম্রাজ্যবাদ, এবং লেনিন জোর দিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদের অসম বিকাশ–

একটি অর্থনৈতিক বিষয়– সাম্রাজ্যবাদের যুগে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বে এমন কিছু বলা নেই যে শুধুমাত্র বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ, বা বিশ্বের বৃহত্তম পুঁজি রপ্তানিকারক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী। লেনিন ১৯১৬ সালে রুশ সাম্রাজ্যকে সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। যদিও রাশিয়ার অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ ছিলো। এবং বস্তুত তখনও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অবস্থার সাথে প্রাক-পুঁজিবাদী বিষয়গুলো যুক্ত ছিলো। ১৯১৬ সালে লেলিন যখন রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন তার থেকেও বড় একচেটিয়া পুঁজি এখন রাশিয়াতে বেশি প্রভাবশালী। একচেটিয়া পুঁজি নিবিড়ভাবে রাষ্ট্রের সাথে একীভূত, এবং মনে রাখবেন যে লেনিন তৎকালীন সময়ে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়কে প্রাথমিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ হিসেবে। পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য আধা-ঔপনিবেশিক এশিয়ান দেশগুলিতে রাশিয়ান একচেটিয়া পুঁজি, অন্যান্য একচেটিয়া পুঁজির সাথে লড়াই করছে।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের পটভূমি মূলত একচেটিয়া পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর ব্যাখা না আছে পুতিনের মনে, না আছে ইউক্রেনের নাৎসিমুক্তকরণ করার ইচ্ছার মধ্যে। রাশিয়ার যুদ্ধ একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ; বাজার, শ্রম ও কাঁচামালের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিদের হাতে পরা থেকে বিরত রাখতে এই যুদ্ধ।
ইউক্রেনের সংঘাতের মধ্যে আমরা তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
–রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ এবং ইউক্রেনীয় মানুষদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব।
–মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইইউ সাম্রাজ্যবাদ এবং এর মধ্যে একদিকে ইউক্রেনীয় দালাল-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া, এবং অন্যদিকে রুশ সাম্রাজ্যবাদ।
–ইউক্রেনের ইউএস/ইইউ ভিত্তিক অংশের মধ্যে দালাল-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া, এবং রাশিয়ান-ভিত্তিক অংশে ইউক্রেনীয় দালাল-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব।
রাশিয়া যখন ইউক্রেন আক্রমণ করেছিল, তখন এর মধ্যে প্রথমটা হয়েছিল প্রাথমিক দ্বন্দ্ব। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রধান দিক মূলত জাতীয় সংগ্রাম এবং অপ্রধান হচ্ছে প্রক্সি যুদ্ধ। ইউক্রেনের জনগণ তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ইউক্রেনিয়ানরা যুক্তরাষ্ট্রের দাবার গুটি নয়। তবুও কোনো সন্দেহ নেই, আমেরিকানরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করতে ইউক্রেনের প্রতিরোধকে ব্যবহার করছে।

আমরা ইউক্রেনীয় জনগণের বিরুদ্ধে রুশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকে নিন্দা করি। আমরা সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের জনগণের অস্ত্র হাতে অধিকার আদায়কে সমর্থন করি। একইভাবে আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বিস্তৃত করাকে সমর্থন করিনা।

সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়
সাম্রাজ্যবাদের এই সময়ে মহাশক্তিদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি সহ একটি "বহুকেন্দ্রীক বিশ্বব্যবস্থা" তৈরি করা সম্ভব নয়। যতদিন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা আছে ততদিন কোন স্থায়ী শান্তি হতে পারে না। লেনিন এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে কাঁচামালের জন্য প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজির দ্বারা বাজারের নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করবে, এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে "শান্তি" এমনকি "সহযোগিতা"র সময়কাল শুধুমাত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি হতে পারে।

উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন পুরানো সাম্রাজ্যবাদীদের ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব অবশ্যই দেখা দেবে। বিশ্বের সর্বহারা বিপ্লবের অংশ হিসেবে, নয়া গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা নিজেরই বিলুপ্তির ধারায় কেবল যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে।

আমাদের অবস্থান
লেনিন এ কথা বলেছেন যে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ ছিলো যে জার্মানি একজন কৃতদাস মালিক যার এক হাজার কৃতদাস আছে, সে যুদ্ধ করছে ক্রীতদাসদের 'ন্যায্য' বণ্টনের জন্য অন্য কৃতদাস মালিক ইংল্যান্ডের সাথে যার দুই হাজার কৃতদাস আছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট' চীন ও রাশিয়াকে সমর্থন করা, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করার মতই অর্থহীন।
লেনিনের ধারাবাহিকতায় আমরা এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অথবা এই সাম্রাজ্যবাদী ব্লক বা ঐ সাম্রাজ্যবাদী ব্লক এগুলোকে সমর্থন করব না। আমরা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতকে এবং বিশ্বের সকল মানুষ যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে সমর্থন করি এবং কমিউনিস্টদের অধীনে পরিচালিত নতুন গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জনযুদ্ধকে সমর্থন করি।

একই সময়ে আমরা জোর দিয়েছি যে সাম্রাজ্যবাদী দেশের কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের প্রধান কাজ নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা অর্থাৎ নরওয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের মিত্র শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ বিরুদ্ধে, এবং নিজের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কাজ করা। একইভাবে, রাশিয়ান সর্বহারা শ্রেণীর একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব আছে রুশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের সাথে জোটবদ্ধভাবে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ বুর্জোয়াদের উৎখাত করবার।

একই কথা, অবশ্যই চীনা সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চীনা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বিপ্লবীরা এই তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির উপর তাদের বিশ্বাস রাখতে পারেন না। চীন, রাশিয়া কেউই বিশ্ব বিপ্লবে অংশ নিবে না। আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়াতকে ভরসা করতে হবে তার নিজস্ব শক্তির উপর।

আমরা বলি

বহুকেন্দ্রবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়! সমস্ত দেশের সর্বহারা এবং সমস্ত বিশ্বের জনগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও।

তথ্যসূত্র:

১. Fukuyama is most known for a book from 1992, The End of History and the Last Man. After Soviet revisionism collapsed, he wrote that the new century would see the worldwide expansion of bourgeois «democracy» and «liberal values». Thus, history was progressing toward a (happy) end.
২. Lenin. 1916. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Under «VI. Division of the World Among the Great Powers». Marxist Internet Archive. https://www.marxists.org/archive/lenin/work/1916 imp-hsc/ch06.htm
৩. Cockburn, Alexander. 1991. «The melancholy passing of real radicalism». San Francisco Examiner. Retrieved from: https://www.massline.info/mlms/ mlch12.htm#n30

[মূল লেখাটি *টু লাইনস স্ট্রাগল* জার্নালের দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০২৩ থেকে নেয়া]

ভারতে ব্রিটিশদের চালিত দাসব্যবসা ও নিপীড়ন
মুর্শেদুল আজাদী

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশরা রাজনৈতিকভাবে পাকা আসনে বসার পর থেকেই এদেশের কৃষি, হস্তশিল্প ও স্বাধীন যে সমস্ত পেশা ছিল তা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। যেসব গ্রামীণ ও শহুরে পেশাকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের জনসাধারণ জীবিকা নির্বাহ করতো, তার পরিবর্তে ব্রিটিশদের লুটেরা কার্যকলাপ ও তৎস্বার্থে আরোপিত পেশা এ অঞ্চলের সহজসাধ্য জীবিকার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। বিপুল এ জনতা (১৭৫৭ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১৩ কোটি থাকলেও ১৮৮১ সালে তা ২৫ কোটি ৪০ লক্ষে দাঁড়ায়) যাদের অধিকাংশের জীবন ছিল কৃষি অর্থনীতি-কেন্দ্রীক, তারা প্রায় আক্ষরিক অর্থেই নিঃস্ব ও সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়ে। নিজ হাতে তৈরি এ বেকারত্বকে ব্রিটিশরা তাদের বিশ্বব্যাপী চালিত উপনিবেশের বিভিন্ন শ্রমখাতে দাস হিসেবে পাঠানো ও এদেশে ছদ্মদাসে পরিণত করার এক অমানবিক কাজে লিপ্ত হয়। ১৮৩০ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা এক আইনের বলে নিষিদ্ধ হয়। এসময় থেকেই বিভিন্ন মেয়াদের চুক্তিতে ভারতীয় শ্রমিকদের ব্রিটিশদের উপনিবেশগুলোতে পাঠানো আরম্ভ হয়। ১৮৩০ সালে শুরু হলেও ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ সালের ভেতরই খোদ মরিসাসে ১৭,০০০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানী করা হয়। এই শ্রমিক রপ্তানীর মধ্যে দিয়েই উপমহাদেশের কৃষিজীবী সরল জনসাধারণকে ছদ্মদাসে পরিণত ও সংগঠিত শিল্পে স্থানান্তরিত করা হয়।

তখন বিশ্বে চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত অঞ্চলগুলোর মধ্যে মরিশাস, ব্রিটিশ গায়েনা, ত্রিনিদাদ ও জ্যামাইকা দ্বীপগুলো ছিল অন্যতম। মূলত সে অঞ্চলের আখের খেত ও চিনি শিল্প ছিল দাসশ্রম নির্ভর। যখন দাস প্রথা বলবৎ ছিল তখন মরিশাস দ্বীপে চিনিশিল্পে কাজ করানোর জন্য শুধু আফ্রিকা থেকেই নয়, বাংলা থেকেও ক্রীতদাস আমদানী করা হতো। দীর্ঘদিনের নিপীড়নের ও দাসপ্রথা বিলোপের দরুন মুক্ত দাস শ্রমিকরা নিপীড়নসর্বস্ব কাজ করতে অপরাগতা প্রকাশ করে। ফলে সেখানে শ্রমিক সংকট দেখা দেয়। কিন্তু চতুর চিনিশিল্প মালিকরা তাদের ঘনিষ্ঠ সহচর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ভারত থেকে পূর্বেই যাদের সহায়হীন ও নিঃস্ব করা হয়েছিল, সে সমস্ত কৃষকদের আমদানী করতে আরম্ভ করে। এই আমদানী করা শ্রমিকরা ছিল দাসত্ব ও স্বাধীনতার মাঝামাঝি অবস্থানে। কেননা তারা সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। চুক্তি মোতাবেক মালিকপক্ষ নামেমাত্র শ্রমিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সাধারণত মাসিক পাঁচ টাকা করে মজুরীর ব্যবস্থা করতো। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কাজ করা ও না করা কখনোই ইচ্ছাধীন ছিল না। তারা ছিলেন মেয়াদীদাস। অথচ তখন কাগজে-কলমে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করেছে বলে ব্রিটিশরা ফলাও করে বেড়াচ্ছিল। আবার তারা যে উপায়ে শ্রমিক সংগ্রহ করতো তাও ছিল রীতিমতো জঘন্য ও ভয়াবহ। তারা ভারতের গ্রামগঞ্জ থেকে আড়কাঠিদের মাধ্যমে শ্রমিক জোগাড় করতো। তখনকার সমাজে দাগী লোকদের আড়কাঠি বলা হতো। এরা গ্রামের সরল, বেকার, ভূমিহীন ও হা-ভাতে শ্রমজীবী মানুষদের মিথ্যা ও প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ভারতের বাইরে যেতে প্রলোভিত করে চুক্তিতে স্বাক্ষর করাতো। চুক্তি স্বাক্ষরিত এই শ্রমিকদের বিভিন্ন বন্দরে এনে সশস্ত্র পাহাড়ায় বেশ কিছুদিন গুদামজাত রেখে ভারতের বাইরে পাঠানো হতো। আরও পরে চিনি উৎপাদন নির্ভর দ্বীপগুলোর বাইরেও ভারত থেকে তারা শ্রমিক পাঠাতো। মাত্র ২৮ বছরে (১৮৪২ থেকে ১৮৭০) প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ভারতের বাইরে পাঠানো হয়। প্রলোভন ও কোথাও কোথাও জোরপূর্বকভাবে সংগ্রহ করা এসব শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষের বাইরে নারী ও শিশু শ্রমিকও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে চালান দেয়া এ শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,০০,০০০ (সাত লাক্ষ)-এ। এ প্রক্রিয়া ১৯১৭ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ঊনিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা শ্রমিক সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীতা ভয়াবহ রূপ নেয়। অতিরিক্ত প্রতিযোগীতার দরুন মিথ্যা ও প্রতারণার বেড়াজালে ফেলে শ্রমিকদের শ্রমিক সংগ্রহের ডিপোতে এনে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে দাসত্বমূলক চুক্তিতে সই করানো হতো এবং বিদেশে চালান করতো। এতে করে আড়কাঠিরা ও এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলে বিপুল টাকা-পয়সা লাভ করতো। শ্রমিক সংগ্রহের হীনপন্থা ও কৌশল সর্ম্পকে হরি বিশওয়ালের দেয়া ভাষ্য আমাদের উপলব্ধিকে পরিষ্কার করে দেয়। হরি বিশওয়াল বলেছেন, 'আমি কটকের অধিবাসী। আমরা চারজন চাকরির সংগ্রহের আশায় কলকাতায় আসছিলাম। পথে বালাসোরে আমরা একটা সরাইখানায় উঠেছিলাম। ঐ একই স্থানে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে একজন তকমাধারী লোকও ছিল। পরদিন সকালে আবার যখন আমরা যাত্রা শুরু করলাম তখন সেই তকমাধারী চাপরাশীটি আমাদের সঙ্গে রাস্তায় এলো এবং কথাবার্তা শুরু করলো। কথায় কথায় সে বলল যে যদি আমরা তার সঙ্গে কলকাতায় যাই তবে সে কলকাতায় আমাদের চাকরি জোগাড় করে দেবে। সে বলল আমাকে মরিশাসে ১০ টাকা বেতনের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। সে আরও বলল যে মরিশাস কলকাতা থেকে মাত্র ৪ দিনের রাস্তা এবং আমি যখন ইচ্ছে তখন চাকরি ছেড়েও দিতে পারি। আমি লোকটির কথায় বিশ্বাস করে চাকরি গ্রহণ করতে রাজী হলাম এবং কলকাতায় এলাম। আমার অন্যান্য সঙ্গীরাও তাই করলো। রাস্তায় সে আমাদের নীরব থাকতে বলল এবং আরও বলল যে আমরা কোথায় যাচ্ছি তা যেন কোন অপরিচিত লোককে না বলি। কলকাতায় পৌঁছনোর পরে শহরের উত্তর দিকে একটা ঘরের মধ্যে আমাদের সবাইকে রেখে দেয়া হলো। আমরা যাতে বাইরে যেতে না পারি তার জন্য দু-তিনজন লোক দরজায় পাহারা দিতে লাগল। কোনো অবস্থাতেই আমাদের বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। যদিও কোনো সময় তা

দেয়া হয়েছে তা ওদের পাহারাতেই দেয়া হয়েছে। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমাদের ব্যাংশালে এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের কঠোর নির্দেশ দেয়া হলো যে ঐ ভদ্র লোকের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই আমরা যেন হ্যাঁ বলি। ভদ্রলোকের কাছে যাওয়ার পর তার প্রতিটি প্রশ্নেরই আমি ইতিবাচক উত্তর দিলাম এবং মরিশাসে যেতে রাজী হলাম। যদিও তখনও আমি জানতাম না মরিশাস কোথায় বা কি ধরনের স্থান এবং এও জানতাম না যে ওখানে জাহাজে করে যেতে হবে। তারপর আমি ওদের কাছ থেকে কিছু জামাকাপড়, একটা টুপি, একটা কম্বল, কিছু পিতলের বাসন, এবং ছয় টাকা নগদ পেলাম। ঐ টাকা থেকে চারটাকা দফাদারেরা লোকজনরা নিয়ে নিল। একটাকা দিয়ে আমার জন্য একটা বাক্স ক্রয় করা হলো এবং বাকী এক টাকা দিয়ে ওরা মিষ্টি ইত্যাদি ক্রয় করলো। এরপর ওরা আমাদের একটা ডিঙি নৌকায় চড়িয়ে দিল। আমি প্রতিবাদ করে বললাম যে আমাকে বলা হয়েছিল মরিশাসে জলপথে যেতে হবে না। তখন ওরা বলল যে আমাদের শুধু নদীটা পার হতে হবে। কিন্তু আসলে আমাদের আরও অনেক লোকের সঙ্গে মাঝনদীতে একটা জাহাজে উঠিয়ে দেয়া হলো।'

হীন ও স্বার্থান্বেষী আড়কাঠিরা সামান্যতমও নৈতিকতা ও নিয়মের ধার ধারেনি। কপটতার ফাঁদে ফেলে জাহাজে উঠানো এসব শ্রমিকদের সাথে মানবেতর আচরণ করা হতো। ১৮৩৮ সালে গঠিত হওয়া তদন্ত কমিটি যে সব সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এমন:

ক্যাপ্টেন জেমস র‍্যাপসনের (সোফিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন) সাক্ষাৎকারঃ

প্রশ্নঃ সোফিয়া জাহাজে কি খুব বেশি রকমের ভিড় হয়েছিল? আপনার মত কি?

উত্তরঃ আমার মতে সাধারণভাবে খুব বেশি লোক নেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করি তিনশো লোক নিলেই যথেষ্ট হতো...(প্রকৃতপক্ষে এই জাহাজে ৩৬৬ জন লোক নেয়া হয়েছিল, ফলে দুইজন জলে মারা যায় এবং আট জন জাহাজে মারা যায়)। অপরদিকে অন্য একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন এ. জি. ম্যাকেঞ্জিকে 'শ্রমিকদের কতবার খেতে দেয়া হতো এবং মরিশাসে তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হতো' বলে প্রশ্ন করা হলে, তিনি উত্তরে বলেন: 'তাদের একবার খেতে দেয়া হতো। আর আমি শুনেছি ওদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করা হতো... ওদের পুরো বেতন দেওয়া হতো না। একজন লোক আমার কাছে অভিযোগ করেছে, সে ওখানে ১৮ মাস ছিল কিন্তু এক ফার্দিং বেতন পায়নি...'

তখনকার সমসাময়িক পত্রিকাগুলোর প্রকাশিত প্রতিবেদনেও বিলেতে চালান দেয়া শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও দাসত্বমূলক জীবনের কথা উঠে আসে। মূলত প্রতারণার শিকার সরল মানুষগুলোকে জাহাজে তোলার পর থেকেই দাস হিসেবে দেখা হতো। মালবাহী জাহাজগুলোতে বস্তা বা পশুর মতো গাদাগাদি করে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো। পথে না পেত পর্যাপ্ত খাবার না পেত চিকিৎসা। ফলে যাত্রাপথেই অনেকে মারা পড়তো। এই শেষ নয়, উপনিবেশগুলোতে জাহাজ ভেড়ানোর পরপরই এদের নামিয়ে দেয়া হতো দৈনিক ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টার কঠিন কাজে। নতুন পরিবেশ ও কাজের ভাবসাব বোঝার সময়টুকুও পেত না। ফলে ক্লান্ত শরীরে ও মনে এক নিদারুন যন্ত্রণা খেলা করতো সবসময়। তাদের কাজ শুরু করতে হতো ঠিক ভোর ৪ অথবা ৫ টার মধ্যে আর শেষ করতে হতো সন্ধ্যা ৪ টায়। তারমধ্যে আখের খেতে ও চিনির মিলের কাজ ছিল আরও পীড়াদায়ক। অনেক ক্ষেত্রেই রাতদুপুরে কাজ শেষ করে ভোরে ওঠে আবার কাজে যেতে হতো। মালিক পক্ষের পেয়াদারা লাঠি ঘুরিয়ে কড়া নজরদারিতে রাখতো সবসময়। রবিবারের দিন ছুটি বা স্বল্পকালীন কাজের কথা থাকলেও পুরোদিনই কাজ করতে হতো। কোথাও কোথাও এদের টানা ১৮ ঘণ্টার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হতো। বাড়তি খাটুনি ফলে সেখানে যারা মারা যেত তাদের মধ্যে ভারতীয়রাই ছিল সংখ্যাধিক্য। এতো খেটেও এদের চুক্তি মোতাবেক বেতন ও থাকা-খাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়নি। মালিক বা মালিক পক্ষের ইচ্ছা উপর নির্ভর করতো এদের বেতন ও ভাতা। অসুখে থাকাকালীন সময়ে এদের বেতন কাটা হতো। মূলত মালিকপক্ষ এদের সাথে সব রকম দাসত্বমূলক আচরণ ও ঠকবাজির খেলা খেলত। এদের কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোথাও যেতে দেয়া হতো না। এরা সংগঠিত হবে এই ভয়ে মালিকপক্ষ নিগ্রো দাসদের সাথে করা আচরণ এদের সাথেও করতো। কোনো শ্রমিক সামান্যতম অবাধ্য হলেও তাকে কঠোর বেত্রাঘাত থেকে রেহাই দেয়া হতো না। অসুস্থতা ও পঙ্গুত্ব থাকলেও জোরপূর্বক এদের দিয়ে কাজ করানো হতো। ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা সবসময়ই যে এ নির্যাতন ও অনাচার মাথা পেতে নিত, তা কিন্তু নয়। মাঝে মাঝে এদের প্রতিরোধের খবরও পাওয়া যায়। কিন্তু এরা নিগ্রো দাসদের সাথে সম্মিলিত কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। বরং মালিকপক্ষ নিগ্রোদের ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষমই হয়েছিল। একবার ব্রিটিশ গায়েনার একটি বাগানের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে জর্জটাউনে অভিযোগ পেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথিমধ্যে ভয়াবহ পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়। গুলিতে ৫ জন নিহত, ৯ জন আহত ও বহু সংখ্যক গ্রেফতার হয়। আবার স্বদেশেও ব্রিটিশরা ভারতীয়দের ব্যাপকহারে জোরপূর্বক দাসত্বমূলক পেশায় স্থানান্তরিত করে।

ঊনিশ শতকের শুরুতেই এদেশে বাগান শিল্পের বিকাশ আরম্ভ হয়। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চা বাগান। প্রতিষ্ঠার অনতিবিলম্বে এই শিল্প ফুলে ফেপে উঠে। শ্রমনির্ভর চা বাগানগুলোতে আরেক অমানবিক কায়দায় কৃষিচ্যুত বেকার শ্রমিকদের নিয়োগ দেয়া হয়। স্থানীয় দালালদের সহায়তায় সরদাররা শ্রমিক সংগ্রহ করতো। সেটা অনেকটাই ছিল বিদেশে শ্রমিক রপ্তানীর মতো প্রতারণামূলক

কায়দায়। তখন আসামের চা বাগানগুলোতে বিহারের ছোট নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে শ্রমিকদের ঢুকানো হতো। ১৯০১ সালে এক আইনের মাধ্যমে সরকার চা বাগানের কর্মচারী ও দালালকে লাইসেন্স ধারী হতে হবে বলে ফরমান জারী হলেও সেই বর্বরোচিত কায়দাতেই শ্রমিক সংগ্রহ এবং তাদের দিয়ে কাজ করানো হতো। এমনও দেখা গেছে যে গ্রামের সরল ও নিঃস্ব নারী, পরুষ ও শিশু নির্বিশেষে জোরপূর্বক বাজারে উঠানো হতো বিক্রির জন্য। দালালরা এ কাজ করতো। আবার ওয়ার্কম্যানস ব্রীচ অব কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট ও ইন্ডিয়ান কোডের বেশ ক'টি ধারায় মালিকদের এক জঘণ্য ক্ষমতা দেয়া হয়। ক্ষমতাবলে যদি কেউ চুক্তিবাতিল করে বাগান ছেড়ে যেতে চায় তবে তাকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ফলে এ চাবাগানের শ্রমিকরাও ছিল দাস বৈ আর কিছু নয়। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের পর ১৯২৬ সালের দিকে গ্রেপ্তারের আইন কিছুটা শিথিল করলেও মালিকপক্ষের আন্তযোগাযোগের ফলে বাগানত্যাগী শ্রমিক নতুন কোথাও আর কাজ নিতে পারে না। অপর দিকে চা-ও পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতে রাবার ও কফি শিল্পও গড়ে উঠে। এ শিল্প দুটিতেও চা বাগানের মতোই শ্রমিক সংগ্রহ করা হতো ও দাসত্বে বেঁধে ফেলা হতো। ১৮৫১ সালে যাত্রা করা চা বাগানে শ্রমিক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৮ সালে স্থায়ীভাবে শ্রমিক ছিল ৯,০৬,৭৮৭ জন। যারা বাংলাদেশ, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের বাগানগুলোতে কাজ করতো।

উপমহাদেশের চা বাগানগুলো জীবন-জীবিকা সম্পর্কে আমাদের কম-বেশি সকলেরই জানা আছে। চা শ্রমিকদের ওপর চালিত শোষণ ও অমানবিক আচরণের নগ্ন চিত্র বারবার সামনে উঠে এসেছে। আসাম অঞ্চলের লোকসাহিত্যে চা বাগানের অমানবিক জীবনের কথা উঠে এসেছে। প্রধানত ব্রিটিশ ধনকুবেরাই ছিল এসব চা বাগানের মালিক। প্রচুর মুনাফাদায়ী এ শিল্প থেকে প্রভূত সম্পদের দেখা পেলেও এরা চা শ্রমিকদের ওপর জুলুম ও শোষণ চালাতে বিন্দ্রমাত্রও নমনীয় হয়নি। এই ধনদৈত্যদের চোখের সামনেই দালাল ও সর্দাররা পাশবিক কায়দায় শ্রমিক সংগ্রহ ও সংগ্রীহিতদের কাজ করাতো। ব্রিটিশরা বেশি কাজ হবে আশায় স্বামী-স্ত্রীকে একসাথে সংগ্রহের সুপারিশ করতো। শুধু প্রভুর মন রক্ষা করতে গিয়ে সর্দার ও দালালরা কত অপরিচিত নারী-পুরুষকে দম্পতি বানিয়ে বাগানে ঢুকাতো, যারা কেউ কাউকে চিনতই না। মিথ্যা ও প্রতারণার পাশাপাশি মদ পান করিয়ে জ্ঞান লোপ পেলে দালালরা এদের বাগানে আনতো। তারপর থেকেই আরম্ভ হতো চা শ্রমিকদের বন্দি শিবিরের জীবন। তারা নামে মাত্র মজুরীতে বংশপরম্পরায় এ জীবন আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে এদের মজুরী ছিল নারী, পুরুষ ও শিশু যথাক্রমে ৪-৫,৬ ও ২-৩ টাকার মধ্যে। এদের কাজের নির্ধারিত সময় ছিল না। পরে ১৮৭০ সালের প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট-এ নারী-পুরুষ-সবার জন্য ৯ ঘণ্টা কাজ ও ১৬ বছরের নিচে কাউকে চুক্তিবদ্ধ না করার কথা বলা হয়। কিন্ত আইন কাগজেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবে ১৬ বছরের কমদের নিয়োগ তো দেওয়া হতো উপরন্তু ৯ ঘণ্টার অধিক রীতিমতো কাজ করানো হতো। দেওয়ান চমনলাল যিনি আসামের চা বাগানের ভয়াবহতার কথা লিখেছেন, তার দুটো ঘটনা এমনঃ

১। '১৯২০ সালের ২৩ জুলাই একজন নারী শ্রমিক তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ডেপুটি কমিশনারের নিকট ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করলো। ফলে ম্যানেজার তার বিরুদ্ধে পালিয়ে যাবার অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা করল এবং স্ত্রী লোকটিকে গ্রেপ্তার করে ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হল।'

২। 'একটি বাগানে সখরুমনি নামে একজন নারী শ্রমিককে মালিক পিটিয়ে হত্যা করল। তারপর তদন্ত হলো ও সরকারী রিপোর্টে বলা হলো "ইউরোপীয় বাগিচা মালিকের কোমল স্পর্শমাত্রই" নারী শ্রমিকটির প্লীহা ফেটে গিয়েছিল।"

আবার ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের দুইজন প্রতিনিধি পার্সেল ও হলসওয়ার্থ ১৯২৮ সালে ভারতে এসে ভারতের শ্রমিকদের সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ তা এমনঃ 'আমরা একদল নারী, পুরুষ ও শিশুকে কাজ করতে দেখলাম। এবং আরও দেখলাম ঠিক তার পাঁচ গজ দূরেই মালিকের একজন সহকারী গর্বের সঙ্গে বেত ঘুরাচ্ছে। এর থেকেই চা শ্রমিকের মতো 'সন্তুষ্ট অবস্থায়' আছে তা প্রমান পাওয়া গেল। আসামের চা বাগানগুলোতে কার্যত ক্রীতদাস শ্রমিকরা হচ্ছে সভ্য জগতের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য মানুষ।' সে সময় সোমপ্রকাশ পত্রিকা, সঞ্জীবনী ও বেঙ্গলী পত্রিকাগুলোতে আসামের চা শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার নিদারুণ বর্ণনা প্রকাশিত হতো। সেখান থেকে জানা যায়, শ্রমিকদের ১০-১২ টাকা বেতন দেবার কথা থাকলেও কোনো সময়ই তারা ১-২ টাকার অধিক পেত না। তাছাড়া প্রাণীদেরও আহার অযোগ্য দ্রব্য শ্রমিকদের খাবার হিসেবে দেওয়া হতো। বাসস্থান ছিল জরাজীর্ণ তো বটেই, উপরন্তু সভ্যদের চোখে তা ছিল দৃষ্টিকটু। প্রতিনিয়তই গালাগালি ও মারধর করা হতো। এইভাবে দিনাতিপাত করতে করতে অনেকেই ভয়ানক সব রোগে আক্রান্ত হয়ে একদম পঁচতে পঁচতে মারা যেত। চিকিৎসা তো দূরের কথা, কাছে ঘেষার মতোও লোক পাওয়া যেত না।

বিভিন্ন সময় দেশীয় ও মালিকপক্ষের দোসর ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছলি যারা চা শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করবে। দেশীয়দের তদন্ত বহুলাংশে বস্তুনিষ্ঠ হলেও ব্রিটিশদের পরিচালিত তদন্ত ছিল আকাশ-কুসুম ও চা শ্রমিকদের জন্য প্রকৃতই দারুণ দুর্ভাগ্যের। তাদের কমিটি সরকারী অফিসার ও বাগান মালিকের সমন্বয়ে গঠিত হতো ও তারা কোন কুলীর (চা বাগানে সাধারণ শ্রমিকদের কুলী বলে সম্বোধন করা হয়) সাথে কথা বলতেন না। আবার শ্রমবিভাজনকে কেন্দ্র করে বাগানে প্রায়ই দাঙ্গা লাগতো। ড. রজনী কান্ত দাস একবার হিসেব করে দেখিয়েছিলে ১৯৮১ সালেই আসামের চা বাগানগুলোতে ১০৬ টি দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। ক্ষুদ ১৯০২-০৩ সালে দাঙ্গার অপরাধে ৮২ জন শ্রমিককে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। অথচ সাদা চামড়ার

বাবুদের নির্যাতন ও প্রহারের আইনী অধিকার ছিল। এরই মাঝে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ দানা বাঁধলে বাগান মালিকরা ব্যাপক লাভবান হন। শতকরা করা লাভের অংক ৪৫০ ভাগে ওঠে। কিন্তু তারা শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা এক পয়সাও বাড়ায়নি। আবার যুদ্ধপরবর্তী মন্দার দরুন চা-র বাজার পরে গেলে শুধু ভাতা ছাড়া আর কিছুই দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। যেখানে মজুরী সমেত ভাতাতেই শ্রমিকদের জীবন চলতো না, সেখানে শুধু মাত্র ভাতা! হায় রে অমানবিক উপহাস!

এমনি করে অধিকাংশের জীবন যখন ওষ্ঠাগত, তারা তখন কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ১৯২১ সাল, দেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। নামী অর্থে তাদের জীবন এতদিন চলেনি, অন্তত মানুষের জীবন তারা পার করেনি। বেত্রাঘাত, নির্যাতনের চিহ্ন এবং পাশবিক অপমানের মনোগত বেদনা নিয়ে তারা দেশে দেশে ফেরার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় কুলীদের দেশে ফেরার উদ্যোগের প্রতি সংহতি জানিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকাও চা শ্রমিকদের সভ্যতাবর্হির্ভূত ও মানবেতর জীবনের বর্ণনা সংবলিত লেখা প্রকাশ করে।

আবার এদিকে বাগান শ্রমিকদের অশিক্ষা ও ক্ষীণস্বাস্থ্য, স্বদেশ থেকে দূরে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর শহুরেপণা ও শ্রমিক নেতাদের চা বাগানে প্রবেশের কড়াকড়ি ইত্যাদি অসঙ্গতির দরুন ঐক্যবদ্ধ হতে বিলম্ব হয়। কিন্তু উপুর্যপরি নিপীড়ন ও জীবনের ক্রমক্ষয়ীষ্ণুতার চাপে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯২০ সালে এ চেতনা তাদের মধ্যে দেশে ফেরার তাগাদা দিতে থাকে। অবশেষে ১৯২১ সালের মে মাসের দিকে তারা দলবদ্ধভাবে বাগান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশের দিকে যাত্রা করেন। অধিকাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ। এদিকে মালিকপক্ষ বাগান ত্যাগ প্রতিরোধে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। করিমগঞ্জ রেলওয়েতে ব্রিটিশ অফিসারদের নির্দেশে কুলিদের রেলের টিকিট দেয়া হলো না। অপারগ কুলীরা পায়ে হেঁটে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে কোনো এক রাজনৈতিক এর হস্তক্ষেপে টিকিট দেয়া হয়। কিন্তু চাঁদপুরের পথে কুলীদের আটকে রাখা হলো। আবার গোয়ালন্দ স্টেশনে প্রায় হাজার খানেক কুলীকে ট্রেন থেকে নামিয়ে সারারাত আটকে রেখে সকালে তাড়িয়ে দেয়া হলো। এদিকে কেউ কেউ কুলীদের মালিকপক্ষের হয়ে ছয় আনা বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেও কুলীরা দেশে ফেরার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। যদিও ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও কলেরায় অনেকেই এর মধ্যে মারা পড়েছিল।

ভয়ভীতি, ছলনা, আটকে রাখা, বেতন বাড়ানো– কোনো কায়দাতেই কুলীদের বাগানে ফেরাতে অপারগ হলে এক নির্মম বর্বতার আশ্রয় নেয় ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে সশস্ত্র পুলিশ জোগাড় করতে থাকে। ১৯২০ সালের ২০ মে'তে কুলীদের চাঁদপুর ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। মাঝরাতে গুর্খা সৈন্যদের সাথে নিয়ে ইংরেজ অফিসাররা চাঁদপুরে ঘুমন্ত ৩০০০ কুলীর ওপর জঘন্য আক্রমণ শুরু করলো। ক্ষুধায় অর্ধমৃত, সরল, ঘুমন্ত, নারী, পুরুষ, শিশু সবাইকে সমানতালে রক্তাক্ত করা হলো। গুর্খা সৈন্যদের বেয়নেটের খোঁচা থেকে মাতৃক্রোড়ের শিশু থেকে মৃতপ্রায় বৃদ্ধাও রেহাই পেল না। স্টেশনে তো বটেই, অনেককে নদীতে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হলো।

দীর্ঘদিনের দাসবৃত্তি থেকে তারা কেবল রেহাই চেয়েছিল। ফিরতে চেয়েছিল বাপ-মায়ের আদি ভিটাতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার তাদের অনেককেই ফিরতে দেয়নি। বিশ্ব ব্যাপী দাসতন্ত্র (চরিত্রে দাস, প্রচারণায় সাহেবীপণা ও সভ্যতার মিথ্যা বিজ্ঞাপণ) চাপিয়ে ব্রিটিশরা যে নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, তার নির্মম শিকার হলো হলো এ অঞ্চলের সরল ও কৃষিজীবী সাধারণ জনতা। যাইহোক, চাঁদপুর স্টেশনে ঘুমন্ত কুলীদের ওপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে জেগে উঠেছিল উপমহাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। চাঁদপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, নেত্রকোণা, গোয়ালন্দ, শিলচর, খালিয়া সহ বরিশাল, সিলেট ও ঢাকার লোকজন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ধর্মঘট পালন করে সরকারী কর্মচারীরাও। তারা কর্মস্থল ত্যাগ করে। সবচেয়ে তুখোড় প্রতিবাদ-আন্দোলন হয় আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে। তারা প্রত্যাবর্তনকারী কুলীদের ওপর জঘন্য হামলার প্রতিবাদে রেলের চাকা বন্ধ করে দেয়।

দুনিয়ব্যাপি সাম্রাজ্যবাদ তার উপনিবেশিক দেশগুলোতে জঘণ্য অত্যাচার চালিয়েছে। বর্তমান সময়েও নয়া উপনিবেশিক পদ্ধতিতে সেই শোষণ জারি আছে। আগের মতোই আমাদের সমতুল্য দেশগুলোতে কৃষি ও শিল্প ধ্বংস হচ্ছে বলে প্রবাসে শ্রমিকরা জীবিকার সন্ধানে যাচ্ছে। এবং সেখানে দাসের মতো জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। আবার এখনও চা শিল্পে-পোশাক শিল্পে উপনিবেশিক আমলের মতোই শ্রম-শোষণ চলছে। তাই কৃষি বিপ্লব সংঘটিতকরণের মধ্য দিয়ে বিদেশী আধিপত্য ও শোষণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপান্তর করে জনগণের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাসহ প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমাজ প্রতিষ্ঠাই একমাত্র পথ। এবং সেখানেই সম্ভবত মানুষকে অমানবিকতার সাক্ষী হতে হবে না এবং দাস-মালিক অঙ্কের ইতি ঘটবে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বাংলাদেশের জনগণের শত্রু
শামীম আহমেদ

“হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ”– সুকান্তের এই বাংলাদেশে ভারত রাষ্ট্রের থাবা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রাচীন কাল থেকেই– পলাশীর প্রান্তরে যে সূর্য ডুবলো উপনিবেশিকতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে। সেই জাতীয় স্বাধীনতা– সার্বভৌমত্ব– জনগণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আজও পায় নি। এখানে সীমান্তের কাঁটাতারে ফেলানীর ঝুলে থাকা, প্রতিনিয়ত লাশ হওয়া আবরারসহ আমাদের অসংখ্য ভাই-বোন, মরা তিস্তা নদী, ফারাক্কা বাঁধ, লুটপাটের রামপাল প্রজেক্ট, রক্তে ভেজা ভাটির দেশের এই তো চিত্র। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসক শ্রেণী বাংলাদেশের জনগণকে নানাভাবে শোষণ করছে। আর তাদের সেবাদাস হিসেবে বর্তমানে ফ্যাসিস্ট গণবিরোধী আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের উপর সে শোষণের পথ তৈরি করে দিচ্ছে। ব্রিটিশরা যেমন ‘ভাগ কর– শাসন কর’ পলিসি নিয়েছিলো তেমনি বাংলাদেশে এযাবৎ সরকারে থাকা দলগুলো জনগণকে বাঙ্গালী/বাংলাদেশী-ইস্যুসহ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নানান ইস্যুতে বিভক্ত করে শোসক শ্রেণী জনগণকে অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি ও পাকাপোক্ত করছে। ১৯৭১ সালে ভারত রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলো অনেকাংশে তাদের বাজার বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে। আমরা যে জনগণের সাম্য-মানবিক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য লড়াই করেছিলাম তাকে ভুলপথে পরিচালিত করেছে তাদের দালালদের মাধ্যমে। ফলে যে রাষ্ট্র তৈরি হলো সেটিও জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙক্ষা– শ্রেণী মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হলো। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি তার স্বাক্ষ্য বহন করে। নানা অসম চুক্তি, অসম বানিজ্য, ট্রানজিট/ করিডর, সীমান্ত হত্যা, নদীর উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে করদ রাজ্যে রূপান্তরিত করার বাসনা খুনী-হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট মোদি সরকারের রয়েছে। তবে একথাও সত্য শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস আমলেও একই শোষণমূলক রাষ্ট্রীয় নীতি ভারত বরাবর হাজির করেছে। বর্তমানে তাদের তথাকথিত ইসলামিক ফোবিয়া তৈরি, কাশ্মীর, সাত রাজ্যসহ স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন এবং মাওবাদীদের উপর নির্মম নিপীড়ণের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট ভারত রাষ্ট্র শুধু বাংলাদেশের নয়, তাদের অভ্যন্তরীণ জনগণসহ দক্ষিণ এশিয়ার নিপীড়িত জনগণের শত্রু।

এমতাবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের শোষণের রূপকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার। শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধিতা করলে সেটা ভুল রাজনৈতিক কৌশল হবে। বরং জনগণের শ্রেণী ও জাতীয় মুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে হবে। ভারত রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের তাবেদার বাংলাদেশের সরকার ও বিভিন্ন দলসমূহসহ বিশ্বের জুলুমবাজ শোষকদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

‘উন্নয়নের মডেল’ এর নামে ভারতসহ সম্প্রসারণবাদী– সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনতামূলক মিত্র সেজে সরকার যে বন্ধুত্ব দেখাচ্ছে তা জনগণের উপর নির্যাতনের কৌশল মাত্র। মনে রাখা দরকার ভারত রাষ্ট্র নিজেই তার জনগণের উপর নির্যাতন করছে আবার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। তাই দক্ষিণ এশিয়ার সকল নিপীড়িত-নির্যাতিত জনগণকে সংগঠিত করে ভারতের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব রুখে দিতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে তীতুমীরের বিদ্রোহ, ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, সাঁওতাল-টংক-চাকমা বিদ্রোহ, তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ির স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে হবে। ভৌগলিক-জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে সময়োপযোগী শ্রেণী ও জাতীয় সংগ্রামের নীতি ও কৌশল গ্রহণ না করতে পারলে বাংলাদেশের জনগণের কাঙ্ক্ষিত সাম্যের পথে সমৃদ্ধ, মানবিক, শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যাত্রা করতে পারবো না।

শ্রেণীসংগ্রামে ছাত্র-যুবাদের অবস্থান ও করণীয়
চূড়ান্ত সাহা

একটা অদ্ভুত ক্ষয়িষ্ণুতার ভেতর দিয়ে যে আমরা যাচ্ছি– তা ক্রমেই টের পাচ্ছি। এবং এই ক্ষয়ের যাত্রা আমাদের স্বেচ্ছায় নয় বরং অনেক বেশি অনিচ্ছাকৃত। ফলে স্বভাবতই এই যাত্রায় আমরা আন্তরিক নই। এই আমাদের বিচ্ছিন্নতা। মার্কস বলেছেন এই বিচ্ছিন্নরা একদিন এক হবে। এক হতে আমরা দেখছিও বটে। তবে এই ঐক্যসমূহও আমাদের পূর্বতন বিচ্ছিন্নতার অনুগামী। যেহেতু এইসব ঐক্য কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাজির করতে পারছেনা। এবং উদ্দেশ্য খুঁজে পাবার মতো কোনো দিশাও পাচ্ছেনা। এইসব বিচ্ছিন্নতাকে যেহেতু আমরা ঠিকঠাক বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ এখনো পাইনি তাই আমাদের এই বিচ্ছিন্নতা অনুভবের বাইরে আর কোনো উপায়ে ধরা পড়ছে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে এখানে কাব্যভাষা হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের সম্বল। এবং সময়ের প্রবণতা হিসেবে বিমূর্ত উপায়ে সবকিছুর উপলব্ধিতেই আমরা ক্ষান্ত।

জীবনে সর্বত্রই আমরা অনুশীলনকে গুরুত্ব দিই। যেহেতু একমাত্র একমাত্র অনুশীলনই আমাদের চারপাশকে মূর্ত করতে পারে স্পষ্টভাবে। অনুশীলনকে প্রাথমিকভাবে আমরা প্র্যাক্টিস, বা 'করা' বা প্রয়োগ ইত্যাদি অর্থে বুঝতে পারি। কিন্তু অনুশীলনকে আমরা আরো বিশেষ ও বিশদভাবে ব্যবহার করি। এই অনুশীলন একটি বিশেষ ভাবাদর্শের। যা এই প্রচলিত ভাবাদর্শকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে এবং বদলাতে আমাদের সহায়তা করে। এই ভাবাদর্শ বা চিন্তা পদ্ধতি কতকগুলো পদ্ধতির সম্মিলন। অবশ্যই তা যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়েই সংগঠিত হয়। তবে আগেই বলা হয়েছে এখানে উদ্দেশ্য বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বদলানো। সুতরাং এইভাবে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ভাবাদর্শের অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। মহাবিশ্বের সর্বত্র যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান তারই প্রেক্ষিতে বস্তুজগতে দ্বান্দ্বিক ভাবে দেখার অভ্যাস। অর্থাৎ একের সাপেক্ষে আরেককে দেখা এবং সেই সাপেক্ষসমূহের মধ্যে নিজের অবস্থান নিরূপণ করে আপাত নিরপেক্ষতার ফাঁকিকে বুঝতে শেখায় যে পদ্ধতি তারই অনুশীলনের কথা আমরা বলছি। এ এক নিরন্তর চিন্তা প্রক্রিয়া। যেখানে চিন্তাই শেষ কথা নয় বরং চিন্তা, চিন্তা থেকে কাজ, আবার কাজ থেকে নতুন চিন্তা। এইযে চিন্তা ও চিন্তার প্রয়োগ ও প্রয়োগ থেকে নতুন চিন্তা একেই আমরা বলছি অনুশীলন। এই অনুশীলনের ভেতর দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আমাদের প্রকৃত অবস্থান। এই যে অর্থনৈতিক কাঠামো তাতে আমাদের অবস্থানের সাপেক্ষে আমাদের চিন্তার তুলনার ভেতর দিয়ে আমরা বুঝতে পারি সমাজের অবকাঠামো ও উপরিকাঠামোর বর্তমান দশা। এর গতিপথ ও তা কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং আমরা ঠিক কোন অবস্থায় আছি। তারপর দাঁড়ায় আমাদের সংগ্রামের সচেতন বোঝাপড়া। এখানে সংগ্রাম এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব যা সারাক্ষণ চলছে আমরা টের পাই বা না পাই। একে সচেতনভাবে ধরতে পারাই আমাদের (আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের) প্রাথমিক কাজ। এবং এভাবে সমাজে বিদ্যমান সংগ্রামসমূহ (যা এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান) ধরার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পক্ষ নির্ণয় করতে পারবো। (নিরপেক্ষও থাকতে পারবো, কিন্তু এই যে সংগ্রাম যেখানে দুইটি প্রধান শ্রেণীর দ্বন্দ্ব প্রকট সেখানে আমাদের যেকোনো অবস্থান কোনো একটি পক্ষেই যাবে। অপেক্ষাকৃত দূর্বল দ্বন্দ্বে বা একটি শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বেও নিরপেক্ষতা অপেক্ষাকৃত সবলের পক্ষেই যায়। বরং সেক্ষেত্রে নিজের সক্রিয় অবস্থান কোনো না কোনোভাবে একটি সমঝোতায় আসতে সহায়তা করতে পারে যদি তার সাথে অন্য পক্ষসমূহের স্বার্থের সংযোগ থাকে। সেক্ষেত্রে যার স্বার্থ অধিকতর নিকটবর্তী তার স্বার্থের সাথেই সংযোগ ঘটে বেশি)। এবার পক্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে সমাজে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র কোনটি অর্থাৎ তাতে পক্ষসমূহ কি কি। সেখানে কোন পক্ষের স্বার্থ নিকটবর্তী। তার ভিত্তিতে আমাদের পক্ষ। এবার পক্ষের সাথে ঐক্য। সেক্ষেত্রে এই নিকটবর্তী স্বার্থের পক্ষসমূহের মধ্যে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তার স্বার্থই আমাদের এই সংগ্রামের ভিত্তি।

এতদূর পর্যন্ত আমাদের অবস্থান নিশ্চিত বোঝা গেলে আমাদের রাজনীতিও স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এইযে শ্রেণীসংগ্রামসমূহ তাতে কারা কারা নিপীড়ক এবং কারা কারা নিপীড়িত। সেক্ষেত্রে নিপীড়ক শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে নিপীড়িত শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বন্দ্বই হলো প্রধান দ্বন্দ্ব। আমরা এই নিপীড়িতের দলে নিজেদের আবিষ্কারের পরেই বিপ্লবী রাজনীতির শুরু। এখানে খুবই স্পষ্টভাবে আমরা আমাদের সংগ্রামের রূপ দাঁড় করাতে পারি প্রধান শ্রেণীসংগ্রামকে ধরার মধ্য দিয়ে। আবার আমাদের উদ্দেশ্য যাবতীয় শ্রেণীসংগ্রামের বিলুপ্তি অর্থাৎ শ্রেণীর বিলুপ্তি আর সেজন্যই আমরা অবলম্বন করি এই শ্রেণীসংগ্রামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত শ্রেণীকে। যে এই সংগ্রামে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসম্বল হয়ে কেবল নিজের শ্রমের জোরে এবং যে এই সম্পত্তির ধারনার পৃথিবীতে একমাত্র সম্পত্তিহীন শ্রেণী।

এভাবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামসমূহে নিজেদের অবস্থান নিরূপণের মধ্য দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রামের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি নিপীড়িত শ্রেনীসমূহের স্বার্থের জোট। অর্থাৎ নিপীড়ক শ্রেণীর সাথে

নিজ শ্রেণীর দ্বন্দ্বে যে যে বিষয়ে আমরা বঞ্চিত, শোষিত বা অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি অন্য সকল নিপীড়ত শ্রেণীসমূহের শোষণের (যা একই কিংবা স্বতন্ত্র হতে পারে) সাথে একতাবদ্ধ করা। অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থকে সঙ্গে নিয়ে সকল নিপীড়ত শ্রেণীর স্বার্থের সাথে নিজেকে বা নিজের শ্রেণীস্বার্থকে যুক্ত করা। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সাধারণ শত্রু নিরূপণ করার ভেতর দিয়ে জোট বাঁধা। এবং গুরুত্ব ও নিপীড়িতের সংখ্যা অনুসারে সমস্ত শত্রুদের ধারাবাহিকভাবে চিহ্নিত করা। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর শত্রু প্রতিটি নিপীড়িত শ্রেণীরই শত্রু (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ)। অর্থাৎ, কৃষি অর্থনীতিতে কৃষকের শত্রু প্রায় সকল নিপীড়িত শ্রেণীর শত্রু। আবার যেহেতু সকলে শত্রু তাই সাধারণ বা প্রধান শত্রুও বটে। এবার কৃষকের বা কৃষির শত্রু বা নিপীড়ক শ্রেণীসমূহকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে তাদের দ্বারা নিপীড়িত শ্রেণীসমুহের শোষণের ধরণকেও চিহ্নিত করতে হবে। এবং ঐক্যের সূত্র বা অবস্থান তৈরি করতে হবে। কেবলমাত্র এই ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামই আমাদের নিজ শ্রেণীর শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারে। এবার এই ঐক্য এবং সংগ্রামে সকল নিপীড়িত শ্রেণীর স্ব স্ব শ্রেণীর বা শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ভেতর দিয়ে একটি সাধারণ প্রতিনিধিত্বে যাওয়ার যে পথ, তাই আমাদের এই শ্রেণিসংগ্রামের বিকাশের পথ। যে সাধারণ প্রতিনিধিত্ব তৈরি হবে এই নিপীড়িত শ্রেণীসমুহের স্বার্থের সাধারণ স্বার্থে কিংবা নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী বা ভিত্তি শ্রেণীর স্বার্থের উপর ভর করে। যাতে এই সংগ্রাম সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর সাথে সকল নিপীড়িত শ্রেণীর ঐক্যের ভেতর দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ বা ম্যাস পিপলের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বা শোষণমুক্তির লড়াইকে।

তাহলে আজকে ছাত্র-যুবকদের প্রধানতম কাজ নিজ শ্রেণীর স্বার্থকে সকল নিপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থের সাথে যুক্ত করা। ছাত্রদের নিজেদের সমস্যার উৎস হিসেবে দেখা যায় শিক্ষা-কাঠামো এবং নিজ শ্রেণী। আবার ছাত্ররা বিবিধ শ্রেণী থেকে আগত হওয়ায় একইসাথে তারা বিবিধ স্বার্থও ধারণ করে। তাই ছাত্রদের শিক্ষা-কাঠামো থেকে উৎপন্ন শোষণ ও বঞ্চনার মুক্তি লড়াইয়ে যেমন সন্নিবেশ ঘটাতে হবে বহু নিপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থের, তেমনি এই শিক্ষা-কাঠামো যেহেতু রাষ্ট্র-কাঠামোর অংশ তাই তার পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য শিক্ষা-কাঠামো কেন্দ্রিক লড়াইকেও যুক্ত করতে মূল বিপ্লবী লড়াইয়ের সাথে। শিক্ষা-লড়াইকে বহু শ্রেণীর সমন্বিত বিপ্লবী লড়াইয়ের অংশ হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা হবে ছাত্রদের প্রধানতম দায়িত্ব। যেহেতু ছাত্ররা এবং যুবারা প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন নিপীড়িত-শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের তাই তাদের মধ্যে আন্তঃঐক্য হবে বহুশ্রেণীর ঐক্যের নমুনা। অর্থাৎ ছাত্র-যুবারা এই বহু শ্রেণীর ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেবে স্ব স্ব শ্রেণী বা অন্য নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষদের কাছে। এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সকল নিপীড়িতের ঐক্যের এক চমৎকার মাধ্যম হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখেন ছাত্র-যুবারা।

জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ

People's Democratic Students Unity (PDSU)